ত্রৈমাসিক

# ইসলামী আইন ও বিচার

: ৪ ॥ সংখ্যা : ১৩ ॥ জানুয়ারি-মার্চ ২০০৮

ইসলামী আইন ও বিচার

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

ISSN 1813 - 0372

# ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা



ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

# ISLAMI AIN O BICHAR

## *ইসলামী আইন ও বিচার*

বর্ষ : ৪ সংখ্যা : ১৩

*প্রকাশনায়* : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ-এর পক্ষে
এডভোকেট *মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম*

*প্রকাশকাল* : জানুয়ারী-মার্চ ২০০৮

*যোগাযোগ* : এস এম আবদুল্লাহ
সমন্বয়কারী
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
১৪ পিসি কালচার ভবন (৪র্থ তলা)
শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩১৭০৫, ফ্যাক্স : ৮১৪৩৯৬৯ মোবাইল : ০১৭১২ ৮২৭২৭৬
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

*প্রচ্ছদ* : মোমিন উদ্দীন খালেদ

*কম্পোজ* : তাসনিম কম্পিউটার, মগবাজার, ঢাকা

*মুদ্রণে* : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

*দাম* : ৩৫ টাকা US $ 3

---

*Published by Advocate **MUHAMMAD NAZRUL ISLAM** General Secretary, Islamic Law Research Centre and Legal Aid Bangladesh. 14, Pisciculture Bhaban (3rd Floor) Shymoli Bus Stand, Dhaka-1207, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Moghbazar, Dhaka, Price Tk. 35 US $ 3*

## সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

# ইসলামী আইনের শাসন মানবতার কল্যাণের একমাত্র পথ

গত জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঢাকায় ইসলামী আইনের ওপর এক আন্তরজাতিক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। এতে ইসলামী আইনের কার্যকর ক্ষমতা নিয়ে দুদিন ব্যাপী বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনা হয়। আমাদের জানা মতে এ ধরনের আন্তরজাতিক সম্মেলন সাম্প্রতিক সময়কালে নিকট ও দূর অতীতে এই প্রথমবারের মতো এদেশে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় কেবল আলোচক ও বক্তাগণ নয়, বিজ্ঞ জ্ঞান পিপাসু উৎসাহী নারী পুরুষ নির্বিশেষে বিপুল সংখ্যক শ্রোতাও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে ইসলামী আইনের প্রতি ব্যাপক আকর্ষণ প্রত্যক্ষ করা যায়।

এদেশের জনসংখ্যায় মুসলমানদের অবস্থান যেখানে নব্বুইয়ের কাছাকাছি সেখানে ইসলামী আইনের আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে প্রবল হওয়াটা কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়। বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী আজ প্রচলিত আইনের ব্যর্থতা যেখানে ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। সভ্যতা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি সত্ত্বেও মানুষের তৈরি আইন সভ্যতা ধ্বংসের কার্যক্রম শুরু করেছে। মানুষের জীবন থেকে শান্তি কেড়ে নিয়েছে। মানুষের প্রতি মানুষের আস্থা এবং রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের সদ্ভাব ও সদিচ্ছাকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুদ ঘুষ দুর্নীতি সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। একক পরাশক্তি ছলে বলে কৌশলে সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করার পাঁয়তারা চালিয়ে যাচ্ছে। সাহায্য সহায়তা ও মানবাধিকার রক্ষার নামে সবল দুর্বলের ওপর চরম নিপীড়ন নির্যাতন ও শোষণ চালাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী অশুভ শক্তি মধ্যযুগীয় ক্রুসেডীয় কায়দায় ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মৌলবাদ উৎখাতের ছদ্মাবরণে লাগাতার যুদ্ধ শুরু করেছে। আতংক ও অবিশ্বাস বিশ্ব বায়ুমন্ডলে এক অস্বাভাবিক অসুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, যার মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাস নেয়াও মানুষের পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছে। এসবই মানুষের তৈরি আইনের ব্যর্থতার ফসল। মানুষ তার হাতে গড়া আইন দিয়ে নিজের জীবন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারছে না। আজ একুশ শতকের বিশ্বে একদিকে জ্ঞান বিজ্ঞানে মানুষের অভূতপূর্ব উন্নতি এবং অন্যদিকে আইনের শাসনে সারা বিশ্বে ব্যাপক ধস মহাসাগরের অতলস্পর্শী ধসের ইংগিত বহন করছে।

অথচ হাজার বছর ধরে ইউরেশিয়া আফ্রিকার বিশাল ভূখণ্ড আল্লাহর আইনে শাসিত হয়ে এসেছে। বিশ্বে শান্তি বিরাজিত থেকেছে। যাবতীয় মানবিক মূল্যবোধ অক্ষুণ্ন থেকেছে। সে আইন মুসলমানদের কাছে এখনো আছে। কিন্তু মুসলমানরা তা ব্যবহার করতে পারছে না। বিগত তিন চারশো বছর থেকে মুসলমানদের চিন্তা জগতে স্থবিরতা নেমে এসেছে, যার ফলে তারা গতিশীল ও সৃজনশীল চিন্তাধারা থেকে দূরে সরে গেছে। তারা ভুলে গেছে মহান আল্লাহ তাদের ওপর কি দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। তাদেরকে বলা হয়েছিল– কুনতুম খাইরা উম্মাতি উখরিজাত লিন্নাস, তা'মুরুনা বিলমা'রুফ ওয়া তানহাওনা আনিল মুনকার ওয়া তু'মিনূনা বিল্লাহ। 'তোমরা শ্রেষ্ঠ জনগোষ্ঠী এদিক দিয়ে যে, তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্য। তোমরা ভালো কাজের আদেশ করবে এবং খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে; আর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও পূর্ণ প্রত্যয় স্থাপন করবে।' (আলে ইমরান : ১১০)

বিশ্বমানবতার বিগত দিনগুলোতে আল্লাহ বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীকে পদে পদে পথনির্দেশ ও জীবন বিধান দিয়ে এসেছেন। একথা আল্লাহর কিতাব তওরাত, যাবুর ও ইনজীলে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। কুরআনে বারবার

এর তাগিদ দেয়া হয়েছে। সূরা মায়েদার ৪৪, ৪৫ ও ৪৭ আয়াতে বলা হয়েছে, যারা এই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ না করে তারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী, যারা আল্লাহর এই বিধান অনুসারে বিধান দেয় না তারা জালেম, অন্যায় ও সীমা লংঘনকারী এবং এই বিধান অনুসারে যারা আইন প্রণয়ন ও বিচার ফায়সালা করে না তারা সত্যত্যাগী।

মুসলমানরা আল্লাহর এ নির্দেশ হুবহু প্রতিপালন করে। প্রথমে তারা একটি সুশৃংখল ও সুবিন্যস্ত আইন ব্যবস্থা গড়ে তোলে। শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনকালে মহান আল্লাহ এ জীবন ব্যবস্থাকে পূর্ণতা দান করেন। 'আজ তোমাদের জন্য আমি তোমাদের জীবন বিধান পূর্ণাংগ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসাবে মনোনীত করলাম।' (সূরা মায়েদা : ৩) প্রথমত একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান, দ্বিতীয়ত এই জীবন বিধান অনুসারে জীবন গঠন করলে ইহকালীন ও পরকালীন নিয়ামত ও আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহের পূর্ণতা এবং তৃতীয়ত এই জীবন বিধান ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত মানুষের জন্য। এই তিনটি বিষয়ই মুসলমানদের জীবনে শান্তি, স্বস্তি ও সমৃদ্ধি দান করে। আর এর মূল পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক ছিল তাদের আইন ব্যবস্থা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় হিজরীপূর্ব তের সনে আল্লাহর প্রথম অহীর মাধ্যমে এই আইন ব্যবস্থার ভিত রচিত হয়। 'ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। খালাকাল ইনসানা মিন আলাক। ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম। আল্লাযী আল্লামা বিল কালাম। আল্লামাল ইনসানা মালাম ইয়ালাম।' (১) 'পড়ো তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। (২) যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে। (৩) পড়ো এবং তোমার রব বড়ই মেহেরবান। (৪) তিনি শিখিয়েছেন কলমের সাহায্যে। (৫) তিনি মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে জনতো না।'

এই পাঁচটি বাক্যের মধ্যে যেকথাগুলো বলা হয়েছে সেগুলোই ইসলামী আইনের বুনিয়াদ ও ভিত রচনা করেছে। প্রথমত সৃষ্টিকর্তাই হচ্ছেন রব। যিনি বস্তু অবস্তু নির্বিশেষে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সবকিছু প্রতিপালন ও নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনিই সবকিছুর মালিক এবং ইলাহ ও আরাধ্য। দ্বিতীয়ত মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তুচ্ছ উপাদন থেকে। মানুষের মধ্যে নিজস্ব কোনো সৃষ্টিক্ষমতা নেই। আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন, এজন্য মানুষের সৃষ্টি কর্মের বড়াই করার কিছুই নেই। তৃতীয়ত মানুষের এই রব আল্লাহ মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল ও করুণাময়। মানুষের নিজের কিছুই নেই। তার যা কিছু আছে সব তার রব আল্লাহর কাছ থেকে তাঁর করুণা হিসাবে প্রাপ্ত। তিনি করুণা করে মানুষকে সবকিছু দিয়েছেন। এর পেছনে মানুষের কোনো কৃতিত্ব নেই। চতুর্থত মানুষের এই রব আল্লাহ তাকে কলমের সাহায্যে জ্ঞান চর্চা করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। এর ফলে সে বংশ পরম্পরায় জ্ঞানের বিকাশ ও সংরক্ষণে সক্ষম হয়েছে। পঞ্চমত মানুষ যা জানতো না তাই তাকে আল্লাহ শিখিয়েছেন। মানুষের জ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত। এই আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষ জ্ঞানচর্চা করে। অন্যথায় বলা যায়, আল্লাহর দেয়া জ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান এবং এই জ্ঞানের ভিত্তিতে গবেষণা পর্যালোচনা ও অনুসন্ধান চালিয়ে মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারে।

এই হচ্ছে এই আইন ব্যবস্থার বুনিয়াদী আকীদা। অর্থাৎ আল্লাহ হচ্ছেন মানুষ ও এই সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থার একক স্রষ্টা রব ও ইলাহ। এই বিশ্ব ব্যবস্থার সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র তিনি। তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত অহী আল কুরআনই একমাত্র সত্য, সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান। মানুষের পৃথিবীতে ও বিশ্বব্যবস্থায় যতটুকু জ্ঞানের ভিত্তিতে শান্তিতে সমৃদ্ধ জীবন যাপন করা সম্ভব ততটুকু জ্ঞানকে পূর্ণতা দান করে তাঁর রসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর তিনি অবতীর্ণ করেছেন কুরআন। এই কুরআনেই আছে মানুষের পৃথিবীতে চলার বিধিবিধান। মানুষ যা জানতো না আল্লাহ তাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ হচ্ছেন এই আইন ব্যবস্থার মূল প্রণেতা। তাঁর রসূল নিজের জীবদ্দশায় এই আইনকে মানবগোষ্ঠীর একজন সদস্য হিসাবে নিজের ওপর এবং নিজের লাখো লাখো সংগী সাথীদের ওপর প্রয়োগ করেন। রসূলের জামানায় তাঁর প্রতি কুরআনের যে অহী নাযিল হতো তিনি তা তাঁর সংগী সাথি সাহাবীগণের সামনে

পেশ করতেন। তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে তার মধ্যকার বক্তব্য সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতেন। এসব করতেন সরাসরি সামনাসামনি ও প্রত্যক্ষভাবে। এর পেছনেও থাকতো আল্লাহর অহীর পরোক্ষ রক্ষণাবেক্ষণ। সূরা আন নজম-এর ৩০৪ আয়াতে বলা হয়েছে : 'তিনি মনগড়া কোনো কথা বলেন না, যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি অহী করা হয় কেবল তাই তিনি বলেন।' আরো সূরা আহযাবের ২১ নং আয়াতে বলা হয়েছে : 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।' এখানে একদিকে আল্লাহর বাণী এবং অন্যদিকে এই বাণী বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে রসূলের কথা, কাজ ও অনুমোদনের ভিত্তিতে এই আইন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। আল্লাহর কিতাব কুরআন (প্রত্যক্ষ অহী) ও রসূলের হাদীস (পরোক্ষ অহী) এই হচ্ছে এই আইন ব্যবস্থার দুটি মূল ভিত্তি। কাজেই এক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত সত্য জ্ঞান ছাড়া অন্য কিছুই এখানে সংযোজিত হয়নি।

রসূলের ইন্তিকালের পর কুরআনের অহী নাযিল হওয়ার সিলসিলা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ইতিমধ্যে আল্লাহ তাঁর দীন ও জীবন ব্যবস্থাকে পূর্ণতা দান করেছিলেন। মানুষের জন্য যতটুকু সত্যজ্ঞানের প্রয়োজন কুরআন নাযিল করে ততটুকু জ্ঞান তাকে দান করেছিলেন। সূরা মায়েদার ৩৩ নম্বর আয়াতে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। অন্যদিকে কুরআন ব্যক্তি পরম্পরায় কণ্ঠস্থ হয়ে মুসলমানদের স্মৃতিতে এবং লিখিত আকারে লিখিত হয়ে কাগজে কলমে সংরক্ষিত হয়ে গিয়েছিল। আর রসূলের কথা, কাজ ও অনুমোদন তাঁর সুন্নাত আকারে সম্ভাব্য সর্বাধিক নির্ভুলতা সহকারে মুসলমানদের কাছে পৌছেছিল। মুসলমানরা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সহী হাদীস বংশ পরম্পরায় সংরক্ষণের একটি সুশৃংখল ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। কুরআনের মতো রসূলের সুন্নাত তথা তাঁর কথা, কাজ ও অনুমোদন সম্ভাব্য সর্বাধিক নির্ভুলতা সহকারে যেভাবে আমাদের কাছে এসে পৌছেছে তার ওপর আমল করা অর্থাৎ কুরআনের মতো তার নির্দেশনা মেনে চলা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব এ ব্যাপারে সাহাবাগণের মধ্যে 'ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে অর্থাৎ তাঁরা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন।

সাহাবাগণ হচ্ছেন রসূলের সবচেয়ে নিকটতম জনগোষ্ঠী। রসূলের কথা ও কাজের তাৎপর্য, প্রেক্ষাপট, পরিপ্রেক্ষিত এবং তাঁর মেজাজ ও মননের সাথে তাঁরাই সবচেয়ে বেশি পরিচিত ও সংশ্লিষ্ট। কাজেই রসূলের সুন্নাত থেকে পথ নির্দেশনা গ্রহণের ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে যে ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে তা শরীয়তের একটি শক্তিশালী দলীলে পরিণত হয়েছে। কারণ কঠিন বিষয়গুলোর ওপর মতবিরোধ সত্ত্বেও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিতে অকাট্য প্রমাণ এবং একটি উল্লেখযোগ্য জনসমষ্টির অংগীকার ভিত্তিক সাক্ষ ছাড়া কোনো বিষয়ে তাঁরা একমত হননি।

ইসলামী আইন ও শরীয়তকে সচল ও গতিশীল রাখার জন্য আমরা সাহাবা ও উলামায়ে মুতাকাদ্দিমীনের (তাবেঈন, তাবা তাবেঈন ও তাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট নিকটবর্তী যুগের উলামায়ে কেরাম) মধ্যে একটি সৃজনশীল কর্মধারা লক্ষ করি। তাঁরা কুরআন ও সুন্নাত থেকে ইসতিদলাল তথা যুক্তি উপস্থাপন ও মাসায়েল উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে সদৃশকে সদৃশের ওপর কিয়াস করেছেন এবং সমতুল্যকে সমতুল্যের নজির হিসাবে তুলে ধরেছেন। এ ব্যাপারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁরা একমত হয়েছেন আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে একজন অন্যজনকে ছাড় দিয়েছেন এবং বিষয়টি মেনে নিয়েছেন। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে কুরআন ও হাদীসের 'নসে' তথা মূল বাণীতে যার উল্লেখ নেই। কাজেই এক্ষেত্রে তাঁরা সংঘটিত সমধর্মী ঘটনার ওপর তাকে কিয়াস করেছেন। নসের সাথে তাকে সংশ্লিষ্ট করার জন্য যেসব শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর সাথে তাকে সংশ্লিষ্ট করেছেন। তারপর তারা এই সদৃশদ্বয় ও সমতুল্যদ্বয়ের মধ্যে সঠিক সমতা বিধান করেছেন। এর ফলে এ দুটি বিষয়ের মধ্যে আল্লাহর হুকুম একই বলে সর্বাধিক নির্ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। আর এভাবে এর ওপর ইজমা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কিয়াস শরীয়ত ও ইসলামী আইনের চতুর্থ দলীলে পরিণত হয়েছে। শ্রেষ্ঠ উলামা ও জমহূরে ফুকাহা তথা অধিকাংশ ফকীহ একে দলীল উপস্থাপন ও মাসায়েল উদ্ভাবনের একটি মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করার

ব্যাপারে একমত হয়েছেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতিক্রমী আলেম ছাড়া আর কেউ ইজমা ও কিয়াসকে অস্বীকার করেননি।

এভাবে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস এ চারটি শক্তিশালী উৎসের ভিত্তিতে ইসলামী আইন ব্যবস্থা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সচল ও গতিশীল হয়েছে। আল্লাহর অহী থেকে এ আইন ব্যবস্থা কখনো বিচ্ছিন্ন হয়নি। জীবন ও যুগ সমস্যা সম্পর্কে মুসলমানরা সব সময় সচেতন থেকেছে। তারা বিভিন্ন দেশ জয় করেছে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আকীদা-বিশ্বাস, আচার-আচরণের সাথে পরিচিত হয়েছে। ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে, ইতিপূর্বে যার সাথে তাদের কোনো পরিচয় ছিল না, সেক্ষেত্রে তারা নির্লিপ্ত না থেকে এবং গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে না গিয়ে আগের সমধর্মী ঘটনাগুলোর ওপর এগুলোকে কিয়াস করে আল্লাহর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অহীর সাথে এগুলোর সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। এভাবে সেখান থেকে অহী ভিত্তিক পথ নির্দেশনা লাভ করেন। ইসলামী ফিকহের পরিভাষায় একে ইজতিহাদ বলা হয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই সাহাবায়ে কেরামকে এই ধরনের ইজতিহাদে উদ্বুদ্ধ করেন। হযরত মু'আয ইবনে জাবালের রা. হাদীস এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। নবী স. তাঁকে ইয়ামেনের শাসক করে পাঠাবার সময় লোকদের সমস্যার ফায়সালা করার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা না পেলে কি করবেন জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'আজতাহিদু বিরায়ী' অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আমি আমার নিজের বিচার বুদ্ধি মোতাবিক ফায়সালা করবো।' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে সন্তোষ প্রকাশ ও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। আর নিসন্দেহে বলা যায়, হযরত মু'আযের এ বিচার বুদ্ধি ও ফায়সালা কুরআন সুন্নাহর চর্চা ও নবীর সোহবতে সংগঠিত। পরবর্তীকালে এ ভিত্তিভূমিই কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস নামে অভিহিত হয়।

হাজার বারোশো বছর ধরে মুসলমানরা এ ভিত্তিভূমিতেই জীবন গঠন ও পরিচালনা করে। ইসলামী শরীয়তের আইন এ ভিত্তি ভূমিতেই সংগঠিত, বিকশিত ও পরিচালিত হয়। খেলাফতে রাশেদা, বনু উমাইয়া, আব্বাসীয়া, ফাতেমীয়া, সালজুকী, পাঠান, মোগল, উসমানী ও তুর্কী শাসকগণ বিগত শতকের প্রথম মহাযুদ্ধ তথা ১৯২০ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই আইনেই বিশ্বের একটি বিশাল অংশ শাসন করেন। ইউরোপীয় কয়েকটি জাতি আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শী হয়ে মুসলমান দেশগুলো পদানত করার পরই বৃটিশ ও রোমান ল' ইসলামী আইনকে সরিয়ে তার জায়গা দখল করে। ততদিনে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী জ্ঞানের চর্চা স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং তাদের ইজতিহাদী চেতনা এর পূর্বেই অবলুপ্ত হয়।

কিন্তু ইসলামী জ্ঞান ও শরীয়ার দুটি মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহর উপস্থিতিতে মুসলমানদের আবার পুনরুজ্জীবিত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। একমাত্র শরীয়া আইনই বিশ্বমানবতাকে সংকটমুক্ত করতে পারে এ বিশ্বাস তাদের মনে দৃঢ় মূল হচ্ছে। ইসলামী আইনের চারটি উৎস কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে আল্লাহর সঠিক সত্য জ্ঞানের দিক নির্দেশনা লাভ করা আজো মোটেই কঠিন ও অসম্ভব বিষয় নয়।

প্রচলিত আইন ব্যবহার করে আমাদের দেশের দুটি বড় সমস্যা দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দমনে আমরা যেভাবে নাকানি চুবানি খাচ্ছি তা উপলব্ধি করেই বাংলাদেশের মহামান্য প্রধান বিচারপতি মো: রুহুল আমীন গত জানুয়ারীর আন্তরজাতিক ইসলামী আইন সম্মেলনে প্রচলিত আইনের ব্যর্থতা নির্দেশ করে বলেছিলেন, 'প্রচলিত আইন সমস্যার মর্মমূলে আঘাত হানতে পারছে না যেটা একমাত্র ইসলাম ও ইসলামী আইনী কাঠামোর মধ্যেই সম্ভব। তিনি বলেন, ইসলামী আইন সমস্যার মূলোৎপাটন করে।'

ইসলামের এ আইনী কাঠামো এখনো মুসলমানদের কাছে সংরক্ষিত আছে। মুসলমানরা যথাযথ জ্ঞানচর্চা ও ইজতিহাদী প্রচেষ্টার মাধ্যমে একে মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করতে পারে।

*–আবদুল মান্নান তালিব*

*ইসলামী আইন ও বিচার*
*জানুয়ারী-মার্চ ২০০৮*
*বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৩, পৃষ্ঠা : ৯-১৫*

# ইসলামী আইনে নরহত্যা ও বাংলাদেশের দণ্ডবিধি : একটি তুলনামূলক আলোচনা

**মুহাম্মদ মূসা**

*ভূমিকা*

ইসলামী আইন প্রয়োগ বা মানবসমাজে বাস্তব অনুশীলনের এক দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতায় সঞ্জীবিত, পরীক্ষিত ও কালোত্তীর্ণ। ইউরোপের সুদূর স্পেন (বর্তমান স্পেন, পর্তুগাল ও ফ্রান্সের অংশবিশেষ) থেকে আফ্রিকা মহাদেশ ও এশিয়া মহাদেশের পূর্ব প্রান্ত (মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া) পর্যন্ত এই বিশাল ভূখণ্ডে শত শত বছর ধরে ইসলামী আইনের রাষ্ট্রীয় প্রয়োগ একে সুসংগঠিত ও সুসংহত করেছে। মহানবী স.-এর যুগ (১৩ বছর), খেলাফতে রাশেদা (৩০ বছর), উমায়্যা খেলাফত (৯০ বছর), আব্বাসী খেলাফত (প্রায় পাঁচ শত বছর) উসমানী খেলাফত (প্রায় আট শত বছর), ভারতে সুলতানী আমল ও মুগল রাজত্ব (প্রায় চার শত বছর) পরিচালিত ও শাসিত হয়েছে ইসলামী আইনে। তৎকালে ইসলামী আইনের বিকল্প সর্বজনগ্রাহ্য কোন আইন ব্যবস্থা ছিলো না। এমনকি খৃস্টান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় উপমহাদেশের শাসন ব্যবস্থা দখলের পরও ১৮৬২ সাল পর্যন্ত এদেশ ইসলামী আইনে শাসিত হয়েছে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশ দখলের সাথে সাথে প্রশাসনিক, বিচার বিভাগীয়, ব্যবসা-বাণিজ্যিক, সামাজিক লেনদেন, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের একটি সুসংহত আইন কাঠামোও লাভ করে। পরবর্তী পর্যায়ে ১৮০২, ১৮০৮, ১৮১৭, ১৮২৫, ১৮২৭ ও ১৮৩২ খৃ. তারা নিজেদের সুবিধা ও মর্জিমাফিক এই আইনে পরিবর্তন আনতে থাকে এবং সর্বশেষ ১৮৬০ খৃ. এই পরিবর্তিত আইন গৃহীত হয় এবং ১৮৬২ সালে তা কার্যকর হয়। কিন্তু আড়াই শত বছর ধরে এই ভারতীয় আইনে (বাংলাদেশ-পাকিস্তানসহ) তাহরীফ (অন্যায় পরিবর্তন) হতে থাকলেও তাকে ইসলামী আইনের মূল ভিত্তি থেকে হটানো সম্ভব হয়নি। বর্তমান আইনের ভিত্তি হচ্ছে রোমান ল' এই বলে আজকাল আমাদের আইনবেত্তাদের ও আইনের ছাত্রদের যে ধারণা দেয়া হয়– তা সম্পূর্ণ ফ্যালাসি।

***বাংলাদেশের দণ্ডবিধি ও ইসলামী দণ্ডবিধি***

আলোচ্য নিবন্ধে ইসলামী আইনের কোন কোন ধারা বাদ দিয়ে কি ধরনের আইন সংযোজন করা হয়েছে তা তুলে ধরাই উদ্দেশ্য। শুধু একটি উদাহরণ দেই। বর্তমান আইনে অপরাধ দর্শনের মূল কথা হচ্ছে– 'সকল মানুষ নির্দোষ, যতক্ষণ পর্যন্ত না আইনী প্রক্রিয়ায় সে অপরাধী সাব্যস্ত হয়।'

---

লেখক : ইসলামী আইনের গবেষক, গ্রন্থকার এবং একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা।

অথচ এ কথাটি বলেছেন ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রা.। তাঁর কথাটি ইমাম মালেক র. সংকলিত সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ আল-মুওয়াত্তায় দেখা যেতে পারে (কিতাবুল আকদিয়া, বাব ২ মা জাআ ফিশ-শাহাদাত, হাদীস নং ৪)। ইসলামী আইনের মূলনীতি বা সূত্র হলো, 'আল-আসলু ফিল ইনসানিল বারাআতু' (মানুষ মাত্রেরই মূল অবস্থা হলো সে নির্দোষ)।

ইসলামী আইনে মানব জীবনের মূল্য ও মর্যাদা অত্যধিক, সে যে ধর্মের, যে বর্ণের, যে দেশের বা যে জাতিরই অন্তর্ভুক্ত হোক। কুরআন মজীদে নরহত্যা বুঝাতে 'কাতলুন নাফস' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 'নরহত্যার অপরাধ অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টির অপরাধ ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করলো। আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো।'[১]

'আল্লাহ যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতীত তোমরা তাকে হত্যা করো না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি তার প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি। কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে। সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই।'[২]

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় থেকেই বোঝা যাচ্ছে, আল্লাহ মানুষের জীবনকে কতো মূল্যবান, পৃথিবীর জন্য তার অস্তিত্ব কতো প্রয়োজনীয় এবং তার জীবন কতো মর্যাদাবান ঘোষণা করেছেন। মহান আল্লাহ ইচ্ছা করেই তাদেরকে অসংখ্য গোত্র ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছেন। 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে এবং তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো।'[৩]

ইংল্যান্ডে রাজার আইনে যেখানে ২২৩ প্রকার অপরাধের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড, সেখানে চৌদ্দ শত বছর পূর্বেই মহানবী স. মাত্র তিন প্রকার অপরাধের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করেছেন : স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে নরহত্যা, বিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচার ও ধর্মত্যাগ (ইরতিদাদ)। অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসৈন্য নিধন একটি ভিন্ন বিষয়। হিরাবা (রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ও ডাকাতি দু'টি অপরাধই বুঝায়) এর ক্ষেত্রেও মৃত্যুদণ্ড নির্ধারিত থাকলেও তাতে ব্যতিক্রম আছে। যেমন বিদ্রোহীরা গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে অনুতপ্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করলে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পেয়ে যায়। একইভাবে ডাকাতিকালে নরহত্যার অপরাধ না করলে ডাকাতের মৃত্যুদণ্ড হয় না।

ইসলামী আইনে মানব জীবন ও মানবদেহের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত অপরাধ ও তার শাস্তিকে একই শব্দে 'কিসাস' বলা হয়। শব্দটির অর্থ 'অনুরূপ বা সমান প্রতিশোধ'। অর্থাৎ যতোটুকু ক্ষতিসাধন করা হয়েছে অপরাধীর ঠিক ততোটুকু ক্ষতিসাধন। ইসলামী আইন সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীতে এই অপরাধ সংক্রান্ত আলোচনার জন্য উক্ত শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রয়েছে যা বিভিন্ন উপ-শিরোনামে বিভক্ত।

ইসলামী আইনে আরো কয়েকটি গুরুতর অপরাধ ও তার জন্য নির্ধারিত শাস্তিকে একই শব্দে 'হদ্দ' বলা হয়। হদ্দ অর্থ সীমা। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে নির্ধারিত সীমা লংঘন করলে অপরাধী গুরুতর শাস্তি ভোগ করবে। যেনা, যেনার মিথ্যা অপবাদ আরোপ, চুরি, ডাকাতি, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ, মাদক গ্রহণ ও ধর্মত্যাগ এই কয়টি অপরাধ সংক্রান্ত বিধান ইসলামী আইনের গ্রন্থাবলীতে 'হদ্দ' শিরোনামের আওতায় আলোচিত হয়েছে। উপরোক্ত দুই প্রকার অপরাধের বাইরে যতো রকমের অপরাধ আছে সেগুলো 'তা'যীর' শিরোনামের অধীন আলোচিত।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর সকল অপরাধ বাংলাদেশে বর্তমানে কার্যকর 'দণ্ডবিধি'র অধীনে আলোচিত হয়েছে, যার ইংরেজি শিরোনাম হলো 'ক্রিমিনাল ল'। এখানে উল্লেখ্য যে, 'ইসলাম ধর্ম ত্যাগ' ইসলামী আইনে সর্বাধিক কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে তা কোন অপরাধ নয়। একইভাবে নারী-পুরুষের যেনায় লিপ্ত হওয়া একটি গুরুতর অপরাধ হলেও, বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে অপরের স্ত্রী না হলে দুই নারী-পুরুষের স্বেচ্ছাসম্মতিতে অনুষ্ঠিত যেনা শাস্তিযোগ্য নয়।

আমি আমার ধারাবাহিক লেখায় উপরোক্ত অপরাধসমূহ সংক্রান্ত ইসলামী বিধান আলোচনা করবো এবং বাংলাদেশের দণ্ডবিধির সাথে তুলনা করবো। আমি দণ্ডবিধির বিশেষজ্ঞ নই, একজন মনোযোগী পাঠক। কোথাও ভুল করলে পাঠক ও বিশেষজ্ঞগণ সংশোধন করে দিবেন।

আলোচনার শুরুতেই বলা হয়েছে, নরহত্যা ঘৃণ্যতম ও গুরুতর একটি অপরাধ। ইসলামী আইনে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে অনুষ্ঠিত নরহত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! নিহতের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী।'[৫]

আয়াতের অর্থ হলো– স্বাধীন ব্যক্তিকে স্বাধীন ব্যক্তি, নারী বা ক্রীতদাস যে-ই হত্যা করুক, কেবল হত্যাকারীরই শাস্তি হবে। নারী ও ক্রীতদাস হত্যার বিষয়টিও অনুরূপ। ইসলামী আইনে নরহত্যাকে প্রধানত পাঁচ ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে– কাতলি আমদ (ইচ্ছাকৃত নরহত্যা), কাতলি শিবহি আমদ (ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বা সন্দেহযুক্ত হত্যা), কাতলি খাতা (ভুলবশত হত্যা), কাতলি শিবহি খাতা (ভুলবশত হত্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বা সন্দেহযুক্ত হত্যা) ও কাতল বিত-তাসাব্বুব (হত্যার উপলক্ষ বা কারণ হওয়া)।

উপরোক্ত আয়াতে কেবল কতলি আমদ (ইচ্ছাকৃত হত্যা)-এর বিধান দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট চারটি অবস্থায় যেহেতু অপরাধীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয়, তাই এ আয়াতে সেই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়নি। আয়াতের আলোকে অপরাধী নারী-পুরুষ, স্বাধীন-ক্রীতদাস, মুসলিম-অমুসলিম যে-ই হোক, অপরাধ প্রমাণিত হলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কেবল দেশের বিচারবিভাগই সুষ্ঠু বিচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে এবং তা কার্যকর করতে পারে। কোর্ট কোন সংস্থা, ব্যক্তিবিশেষ বা নিহতের ওয়ারিসদের মাধ্যমেও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারে। বিনা বিচারে কেউ হত্যাকারীকে হত্যা করলে সেও নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হবে।

বাংলাদেশে কার্যকর দণ্ডবিধির ধারা-২৯৯ থেকে ধারা-৩০৮ পর্যন্ত সংগাসহ মানবজীবন ক্ষুণ্নকারী অপরাধসমূহ বিধৃত হয়েছে। এই আইনেও সন্দেহাতীতভাবে অপরাধ প্রমাণিত হলে অপরাধীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এবং তা কার্যকর করা বাধ্যতামূলক।

*অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন বা সমঝোতা স্থাপন*

কিসাস বিধি মোতাবেক নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ অর্থকড়ি গ্রহণ করে অথবা নি:স্বার্থভাবে স্বেচ্ছায় অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারে এবং তাতে আদালত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে না, যদি অপরাধী পেশাদার খুনী না হয়ে থাকে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, 'তবে তার ভাইয়ের পক্ষ

থেকে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা এবং সততার সাথে তার প্রাপ্য পরিশোধ করা বিধেয়। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে তার জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।'[৬]

আয়াতের মধ্যে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় : ১. অপরাধীকে ক্ষমা করার সুযোগ আছে, ২. এই ক্ষমা প্রদর্শন ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের একটি অধিকার, ৩. ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ অর্থের বিনিময়েও ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারে এবং ৪. নি:স্বার্থভাবেও ক্ষমা করতে পারে, ৫. ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যথাযথভাবে এবং কোনরূপ টালবাহানা না করে ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করবে, ৬. সমঝোতার এই ব্যবস্থা মানবজাতির জন্য আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ ও সুবিধাদান, ৭. সমঝোতা স্থাপনের এবং তার শর্তাবলী কার্যকর হওয়ার পর বাদী-বিবাদী কোন পক্ষ বাড়াবাড়ি করলে, সীমালংঘন করলে তার জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।

হন্তাকে ক্ষমা করার এই অধিকার একচ্ছত্রভাবে নিহতের ওয়ারিসগণের। আদালত বা সরকারি কর্তৃত্বসম্পন্ন কোন ব্যক্তি বা সংস্থা উপরোক্ত অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। অনুরূপভাবে মৃত্যুদণ্ডও সরকারি কর্তৃত্বসম্পন্ন কোন ব্যক্তি বা সংস্থা ক্ষমা করতে বা রহিত করতে পারে না, তবে ওয়ারিসগণকে অনুরোধ করতে পারে। এই বিষয়ে উম্মতের সকল মাযহাবের আইনবেত্তাগণ (ফকীহগণ) একমত।

"ওয়াইল ইবনে হুজুর (রা.) বলেন, আমি মহানবী স.-এর নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় এক হন্তাকে তার গলায় রশি বেঁধে নিয়ে আসা হলো। নবী স. নিহতের অভিভাবককে ডেকে এনে বলেন, তুমি কি তাকে ক্ষমা করবে? সে বললো, না। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি দিয়াত (রক্তপণ) গ্রহণ করবে? সে বললো, না। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি তার মৃত্যুদণ্ড চাও? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন, তাহলে তাকে নিয়ে চলে যাও। সে চলে যেতে থাকলে তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি তাকে ক্ষমা করবে? সে বললো, না। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি দিয়াত গ্রহণ করবে? সে বললো, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি তাকে হত্যা করবে? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন, তাহলে তাকে নিয়ে চলে যাও। এভাবে চতুর্থবার মহানবী স. বলেন, শোন! তুমি যদি তাকে ক্ষমা করো তবে তার গুনাহ এবং নিহত ব্যক্তির গুনাহের বোঝা তার উপর চাপবে। ওয়াইল রা. বলেন, অতএব সে হন্তাকে ক্ষমা করে দিলো। আমি তাকে তার গলার রশি টানতে টানতে চলে যেতে দেখেছি।[৭]

উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কিসাস-এর আওতাভুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ অপরাধীকে ক্ষমা করার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে অনুরোধ করতে পারে। কিন্তু হদ্দ-এর আওতাভুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে ক্ষমা করার সুপারিশের কোন সুযোগ নেই।

অপরদিকে নিহতের অভিভাবক/ওয়ারিসগণ হন্তার মৃত্যুদণ্ড ক্ষমা করতে সম্মত না হলে তা কার্যকর করতে বাধা দেয়া বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা গুরুতর অন্যায়। মহানবী স. বলেন, কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত হত্যার শিকার হলে হন্তার মৃত্যুদণ্ড হবে। কেউ তা কার্যকর করতে বাধা দিলে বা তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে তার প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতাকুল ও গোটা মানবজাতির অভিসম্পাত। তার ফরয বা নফল কোন প্রকারের ইবাদত কবুল করা হবে না।[৮]

কোন ব্যক্তির অভিভাবক/ ওয়ারিস না থাকলে ইসলামী বিধানমতে রাষ্ট্রপ্রধানই তার অভিভাবক। এক্ষেত্রে হন্তাকে ক্ষমা করার নিরংকুশ অধিকার তার রয়েছে। মহানবী স. বলেন, 'যার অভিভাবক নেই, আমিই তার অভিভাবক'।[৯]

### *ক্ষমার বিনিময়*

বাদীপক্ষ দিয়াত (রক্তপণ) গ্রহণ করে অথবা উভয় পক্ষের মধ্যকার সমঝোতা মোতাবেক ধার্যকৃত অর্থ গ্রহণ করে অথবা কোনরূপ আর্থিক স্বার্থ লাভ ব্যতিরেকে হন্তাকে ক্ষমা করতে পারে। মহানবী স. বলেন, 'কেউ নিহত হলে তার ওয়ারিসগণের জন্য কিসাস (মৃত্যুদণ্ড) অথবা জরিমানা যে কোন একটি গ্রহণের এখতিয়ার থাকবে।'[১০]

'কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে তাকে নিহতের ওয়ারিসগণের নিকট সোপর্দ করা হবে। তারা চাইলে তাকে হত্যা করবে অথবা চাইলে দিয়াত গ্রহণ করবে। তা হলো–তিরিশটি তিন বছর বয়সী, তিরিশটি চার বছর বয়সী এবং চল্লিশটি গর্ভধারী উষ্ট্রী। এটা হলো কঠোর দিয়াত। তবে উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হলে তদনুযায়ী ক্ষতিপূরণ ধার্য হবে'।[১১]

### *মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পন্থা*

তরবারি দ্বারাই হন্তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে। এ বিষয়ে মহানবী স.-এর নির্দেশ হলো : 'তরবারি দ্বারাই মৃত্যুদণ্ড (কিসাস) কার্যকর করতে হবে।'[১২]

মৃত্যু ঘটার পর লাশের কোনরূপ অবমাননা করা, হস্ত-পদ বা দেহের কোন অংশে আঘাত হানা বা কর্তন করা, সমালোচনা করা, হেয় প্রতিপন্ন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। 'মহানবী স. লাশ কর্তন বা বিকৃত করতে নিষেধ করেছেন।'[১৩] মহানবী স. আরো বলেন, 'তোমরা মৃত ব্যক্তিদের গালি দিও না। কারণ তারা তাদের কর্মফল প্রাপ্তির স্থানে পৌঁছে গিয়েছে।'[১৪]

### *বাংলাদেশে বলবৎ দণ্ডবিধি*

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনাধীনে ইসলামী শরীআতের দণ্ডবিধি কার্যকর ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এই উপমহাদেশ দখলের পর শতাধিক বছর পর্যন্ত উক্ত দণ্ডবিধিই বহাল ছিল। খৃস্টান শাসক গোষ্ঠী ১৯ শতকের ষাটের দশকে (১৮৬০-৬২ খৃ.) তাদের মর্জিমাফিক এই আইনে সংশোধনী এনে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে 'ক্রিমিনাল কোড' নামে কোর্ট-কাচারিতে কার্যকর করে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর এখানে উপরোক্ত আইনই বলবৎ থাকে। বিভিন্ন পর্যায়ে সংশোধনী (ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে বিকৃতি) আনয়নের মাধ্যমে বর্তমান বাংলাদেশেও উক্ত দণ্ডবিধি কার্যকর রয়েছে। কিন্তু আইনের মূল কাঠামো বা ভিত্তি যেহেতু ইসলামী দণ্ডবিধি তাই সংশোধনী আনয়নের পরও এর অন্তত আশি শতাংশ ইসলামী দণ্ডবিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রয়ে গেছে। অর্থাৎ বাংলাদেশে বলবৎ দণ্ডবিধির ভিত্তি রোমান ল'-ও নয় এবং বৃটিশ কমন ল'-ও নয়। এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ইসলামী আইনের অধীন কিসাস, হুদূদ ও তা'যীরকে দণ্ডবিধিতে উপরোক্তভাবে স্বতন্ত্র শ্রেণীবিভাগ না করে দণ্ডবিধি শিরোনামেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান দণ্ডবিধিতে বিশেষ করে হুদূদ আইনেই বেশি হস্তক্ষেপ করা হয়েছে।

### মৃত্যুদণ্ড প্রসংগ

দণ্ডবিধির ২৯৯ ধারা অনুসারে সন্দেহাতীতভাবে ইচ্ছাকৃত হত্যা প্রমাণিত হলে অপরাধীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। একইভাবে ইসলামী আইনেও অপরাধীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তবে ইসলামী আইনে মামলার পক্ষবৃন্দের মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের ব্যবস্থা রয়েছে, যা বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে নেই। এই ধারাটি দণ্ডবিধিতে সংযোজনের মাধ্যমে কুরআনের বিধানের সাথে এর বৈপরীত্য দূর করা যেতে পারে।

### মৃত্যুদণ্ড মওকুফ প্রসংগ

নরহত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড কেবল নিহতের ওয়ারিসগণই ক্ষমা করতে পারে, অন্য কেউ নয়। এমনকি মহানবী স.-এর অনুরোধ সত্ত্বেও যারা মৃত্যুদণ্ড ক্ষমা করতে সম্মত হয়নি, সেক্ষেত্রে তিনি অপরাধীর মৃত্যুদণ্ডই বহাল রেখেছেন।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৯ ধারামতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে কেবল রাষ্ট্রপতিই ক্ষমা করতে পারেন। ধারাটি নিম্নরূপ : 'কোন আদালত, ট্রাইবুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।'

ইসলামী আইন অনুসারে নরহত্যা ও ব্যভিচারজনিত মৃত্যুদণ্ড রাষ্ট্রপ্রধানসহ কোন কর্তৃপক্ষই ক্ষমা করতে পারে না। এই দু'টি ক্ষেত্র ব্যতীত অপর যে কোন ধরনের মৃত্যুদণ্ড ভিন্ন দণ্ডে রূপান্তরের বা ক্ষমা করার সুযোগ রাষ্ট্রপ্রধানের রয়েছে। অতএব সংবিধানের উক্ত ধারাটি সামান্য সংশোধন করলেই কুরআনের একটি দ্ব্যর্থহীন নির্দেশের সাথে এর বৈপরীত্য থাকে না। যেমন এতটুকু কথা যোগ করলেই সংশোধন হতে পারে 'নরহত্যা ও ব্যভিচারজনিত মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত'।

### মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পন্থা

দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা মোতাবেক অপরাধীকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হয়। এটা মূলত শ্বাসরোধ করে হত্যা করারই নামান্তর। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিষাক্ত ইনজেকশন পুশ করে, বিদ্যুতের চেয়ারে বসিয়ে, গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে, ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলী করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। এসব পদ্ধতিতে মাথার সাথে দেহের সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত দণ্ডভোগকারী নির্যাতিত হতে বা কষ্টভোগ করতে থাকে।

ইসলামী আইনে একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বক্ষেত্রে তরবারির একটি মাত্র আঘাতে দেহ থেকে মাথা ছিন্ন করার মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার বিধান রয়েছে। রসূলুল্লাহ স. বলেন, 'লা কাওয়াদা ইল্লা বিসায়ফ' ('তরবারির আঘাতেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে')।[১৫]

উপরোক্ত পদ্ধতিতে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত অনেক কম নির্যাতিত হয় বা কষ্টভোগ করে। কারণ ঘাড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথে যাবতীয় অনুভূতি শক্তি সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। অতএব দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা সংশোধনপূর্বক উপরোক্ত পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পদ্ধতি প্রবর্তন করা যায় কি না তা বিবেচনার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাই।

*অমুসলিম নাগরিকদের প্রসংগ*

দণ্ডবিধিতে ইচ্ছাকৃত হত্যার যেসব বিধান অন্তর্ভুক্ত আছে তা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের উপর প্রযোজ্য, এমনকি এদেশে অবস্থানরত বিদেশী নাগরিকও এই বিধির আওতাভুক্ত। ইসলামী আইনের সাথে উপরোক্ত বিধির বৈপরীত্য নেই। উপরন্তু ইসলামী বিধানের অধীনে হন্তার সাথে অর্থের বিনিময়ে বা নিঃস্বার্থভাবে সমঝোতা চুক্তি করার এবং তাকে রক্ষা করার যে স্বাধীন এখতিয়ার ওয়ারিসগণকে দেয়া হয়েছে সেই সুযোগ ধর্মমত নির্বিশেষে সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

*তথ্যপঞ্জি*


১. সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত নং ৩২।
২. সূরা আল-মাইদা, আয়াত নং ৩৩।
৩. সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত নং ১৩।
৪. সুনান আন-নাসাঈ, কিতাবুল কাসামা, বাব ৫-৬, নং ৪৭২৫; তাহরীমুদ-দাম, বাব ৫, নং ৪০২১, বাব ১১, নং ৪০৫৩, বাব ১৪, নং ৪০৬২; সহীহ্ বুখারী, দিয়াত, বাব ৬, নং ৬৮৭৮; মুসলিম, কাসামা, বাব ৬, নং ৪৩৭৫/২৫, ৪৩৭৭/২৬; আবু দাউদ, হুদূদ, বাব ১, নং ৪৩৫২-৪৩৫৩; তিরমিযী, হুদূদ, বাব ১৫, নং ১৪৪৪ হাদীসের সাথে সংযুক্ত; দারিমী, সিয়ার, বাব ১১, নং ২৪৪৭; হুদূদ, বাব ২, নং ২২৯৭; মুসনাদ আহমাদ, ১ খ., পৃষ্ঠা ৬১-২, নং ৪৩৭ (আরো বহু স্থানে)।
৫. সূরা আল-বাকারা, আয়াত নং ১৭৮।
৬. পূর্বোক্ত বরাত।
৭. সুনান আবু দাউদ, কিতাবুদ দিয়াত, বাব ৩, নং ৪৪৯৯; মুসলিম, কাসামা, বাব ১০, নং ৪৩৮৮/৩৩ (সংক্ষিপ্ত); নাসাঈ, কাসামা, বাব ৬-৭, নং ৪৭২২-৪৭৩৪; ইবনে মাজা, দিয়াত, বাব ৩৪, নং ২৬৯১।
৮. নাসাঈ, কাসামা, বাব ৩১-৩২, নং ৪৭৯৩-৪৭৯৪; আবু দাউদ, দিয়াত, বাব ১৫, নং ৪৫৩৯।
৯. মুসনাদ আহ্মাদ, ৪ খ., পৃষ্ঠা ১৩৩, নং ১৭৩৩১।
১০. নাসাঈ, কাসামা, বাব ২৯-৩০, নং ৪৭৮৯-৯০; আবু দাউদ, দিয়াত, বাব ৪, নং ৪৫০৬।
১১. ইবনে মাজা, দিয়াত, বাব ৪, নং ২৬২৬।
১২. ইবনে মাজা, দিয়াত, বাব ২৫, নং ২৬৬৭-২৬৬৮।
১৩. বুখারী, মাজালিম, বাব ৩০, নং ২৪৭৪; যাবাইহ, বাব ২৫, নং ৫৫১৬; আবু দাউদ, হুদূদ, বাব ৩, নং ৪৩৬৮।
১৪. সহীহ্ আল-বুখারী, জানাইয, বাব ৯৭, নং ১৩৯৩; রিকাক, বাব ৪২, নং ৬৫১৬; তিরমিযী, বিরর, বাব ৫১, নং ১৯৮২; নাসাঈ, জানাইয, বাব ৫২, নং ১৯৩৮; মুসনাদ আহমাদ, ৬ খ., পৃষ্ঠা ১৮০, নং ২৫৯৮৪; দারিমী, সিয়ার, বাব ৬৮, নং ২৫১১।
১৫. সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুদ দিয়াত, বাব ২৫, নং ২৬৬৭-৮।

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৮
বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৩, পৃষ্ঠা : ১৬-৩০

# দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত ও ওশর এর ভূমিকা

মোহাম্মদ আনিসুর রহমান

### প্রারম্ভিকা

দারিদ্র্য বলতে আমরা সাধারণত বুঝি সম্পদের অভাব বা অসচ্ছলতার কারণে সৃষ্ট কোন পরিস্থিতি, যেখানে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী তার অপরিহার্য মৌলিক প্রয়োজন পূরণে প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণ করতে পারছে না। এতে স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় সম্পদের স্বল্পতাই দারিদ্র্যের কারণ। তাই সম্পদ বৃদ্ধি পেলেই এই দরিদ্রতা দূর হতে পারে। সম্পদ বৃদ্ধি করাই আমাদের একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত।

সম্পদ কিভাবে বৃদ্ধি পাবে তা আলোচনার আগে যাকাত এবং ওশরের শাব্দিক বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। শাব্দিকভাবে যাকাত, ওশর ও দারিদ্র্যের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য বা সম্পর্ক আছে কিনা তা অনুধাবনের চেষ্টা করতে হবে। যাকাত ও ওশর দ্বারা যদি সম্পদের বৃদ্ধি হয় তাহলে তা অবশ্যই দারিদ্যের পরিপূরক। সম্পদের অভাবেই যে দারিদ্র্য,সম্পদ বৃদ্ধি পেলেই তো সেই দারিদ্র্য দূর হতে পারে।

এই নিবন্ধে প্রথম পর্যায়ে যাকাত ও ওশর এর শাব্দিক বিশ্লেষণসহ মানুষের সাধারণ দৃষ্টিতে কিভাবে সম্পদ বৃদ্ধি পায় তা আলোচনা করা হবে এবং এর পরে সম্পদ বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ্ কি বলেছেন তা পবিত্র কুরআনের আলোকে আলোচনা করব।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা করা হবে সম্পদশালী কেন যাকাত দিবে? এর পর যাকাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন দলিল ও নির্দেশনা পেশ করব।

তৃতীয় পর্যায়ে আলোচনা করা হবে যাকাতের নিসাব সম্পর্কে।

চতুর্থ পর্যায়ে থাকবে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র।

### প্রথম পর্যায়

#### যাকাত শব্দের বিশ্লেষণ

আভিধানিক অর্থ : যাকাত অর্থ, 'যে জিনিস ক্রমশ বৃদ্ধি পায় ও পরিমাণে বেশি হয়। অমুক ব্যক্তি যাকাত দিয়েছে অর্থ তার সম্পদ সুস্থ ও সুসংবদ্ধ হয়েছে। অতএব যাকাত হচ্ছে 'বরকত', পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া, প্রবৃদ্ধি লাভ, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা-শুদ্ধতা-সুসংবদ্ধতা।[১]

---

লেখক: প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঘিওর সরকারী কলেজ, ঘিওর, মানিকগঞ্জ।

'লিসানুল আরব' গ্রন্থে বলা হয়েছে যাকাত শব্দের মূল আভিধানিক অর্থঃ পবিত্রতা, ক্রমবৃদ্ধি, আধিক্য ও প্রশংসা। এ সব কয়টি অর্থই কুরআন ও হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। ওয়াহেদী প্রমুখ বলেছেন, বাহ্যত আসল অর্থ হচ্ছে আধিক্য ও প্রবৃদ্ধি।
কৃষি ফসল বৃদ্ধি পেয়েছে- যেমন করে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। আর যে জিনিসই বৃদ্ধি পায়, তাই যাকাত হয়। আর কৃষি ফসল ক্রমবৃদ্ধি পাওয়া কেবল তখনই সম্ভব, যখন তা আবর্জনা মুক্ত হয়।[২]
অর্থাৎ, ফসলের ক্ষেত যখন আবর্জনা মুক্ত হয় তখন সেখানে ফলন বৃদ্ধি পায়। আবার সেই আবর্জনা অন্যত্র ব্যবহার করা যায়। ফলে সম্পদ সবদিক দিয়ে বৃদ্ধি পায়। এভাবে যাকাত সম্পদ বৃদ্ধি করে। তাই শাব্দিক বিশ্লেষণেও যাকাত অর্থ বৃদ্ধি বা পবিত্রতা।

### ওশর

ওশরের সাথেও সরাসরি দারিদ্র্য বিমোচনের সম্পর্ক রয়েছে। ওশর অর্থ এক-দশমাংশ। জমিতে উৎপাদিত ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ রাষ্ট্রকে কর হিসেবে দেয়ার নাম ওশর। সাধারণ ভাষায় একে ফসলী কর বলা যেতে পারে। যে জমিতে কোন সেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না, যাতে চাষাবাদ করতে কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করতে হয় না , এ ধরনের জমিকে ওশরী জমি বলা হয়। আর যে জমিতে সেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় সেখান থেকে অর্ধ-ওশর, অর্থাৎ বিশ ভাগের একভাগ আদায় করতে হয়।
ভূমির মালিক আল্লাহর অনুগ্রহের শুকরিয়া স্বরূপ ওশর প্রদান করে এবং ভূমিহীনরা সরাসরি এই খাদ্যশস্য পাওয়ার দ্বারা দারিদ্র্যের সর্বশেষ পরিণতি খাদ্যাভাব থেকে মুক্তি পায়। ফলে জীবনের সবচেয়ে বড় মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয়। দারিদ্র্য দূরীকরণে ওশর যে একটি কার্যকর পদ্ধতি তা পরবর্তিতে আলোচনা করা হবে।
যাকাত-ওশরের উপরিউক্ত বিশ্লেষণের দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধির আলামত পাওয়া যায়।

### *মানুষের দৃষ্টিতে সম্পদ বৃদ্ধি*

স্বভাবগতভাবে সবকিছুতেই মানুষ নিশ্চিত লাভ করতে চায়। এই ক্ষেত্রে সে সবসময় সেই পদ্ধতি চিন্তা করে যেখানে তার যা আছে তা কমে যাবে না; উপরন্তু সময়ের সাথে সাথে তা আরও বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ সম্পদকে সে সবসময় ঝুঁকিমুক্ত রাখতে চায়। এইসব বিচারে মানুষ সুদের কারবারে অর্থ অথবা সম্পদ খাটাতেই বেশি পছন্দ করে। সুদ হল মানুষের কাছে অর্থ বৃদ্ধির নিশ্চিত পদ্ধতি। সুদকে আমরা এভাবে সংগায়িত করতে পারি— সুদ হল সেই বিনিয়োগ যেখানে আসলসহ আরও **অতিরিক্ত ফেরত পাওয়ার শর্ত থাকে, যার কোন বিনিময় মূল্য নেই (অতিরিক্তের), সময়ের সাথে** গুণে গুণে বৃদ্ধি পায় এবং কারবারের লাভ ক্ষতির সাথে এর কোন সম্পৃক্ততা নেই। অর্থাৎ, ঋণগ্রহীতা সেই অর্থ যেখানেই ব্যবহার বা বিনিয়োগ করুক তাতে ঋণদাতার কিছু যায় আসে না। সেখানে লাভ লোকসান যাই হোক ঋণদাতাকে শর্ত অনুযায়ী অতিরিক্তসহ আসল ফেরত দিতে হবে। ফেরত দিতে সময় যত বেশি লাগবে সুদ তত বৃদ্ধি পাবে।

অর্থ-সম্পদ যা আছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তা আরও বৃদ্ধি করার জন্য সুদ মানুষের কাছে একটি নিশ্চিত পদ্ধতি। কিন্তু, এভাবে কি সম্পদ আসলেই বৃদ্ধি পায়?

### *আল্লাহর দৃষ্টিতে সম্পদ বৃদ্ধি*

**এক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক কি বলেছেন?**

**আল্লাহ্ বলেছেন, 'মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা** ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক (তাই বৃদ্ধি পায়); এরাই সমৃদ্ধশালী।'[৩]

মানুষ বাস্তবে দেখছে সুদে টাকা খাটালে আসল অতিরিক্ত বা সুদসহ ফিরে আসে, কিন্তু আল্লাহ্ বলেছেন সুদে ধন সম্পদ বৃদ্ধি পায় না। আমরা চোখে দেখছি বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর আল্লাহ্ বলছেন বৃদ্ধি পায় না, তাহলে সুদ কি এক ধরনের মরীচিকা?

আসলেই সুদ একধরণের মরীচিকা। সুদে সম্পদ বৃদ্ধি পায় না; বরং যাকাতেই সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

### *যাকাতে সম্পদ বৃদ্ধি পায়*

আল্লাহ্ মানুষের সৃষ্টিকর্তা সৃষ্ট জীবের জ্ঞান ততটুকু থাকে, যতটুকু স্রষ্টা ইচ্ছা করেন। তাই আমাদের দৃষ্টিতে যা বৃদ্ধি পায় আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা বাড়ে না।

সুদের মাধ্যমে যে সম্পদ বাড়ে না তা একটি উদাহরণের মাধ্যমে আলোচনা করা যাক।

যদি কোন ব্যক্তি ১০০০ টাকা ১০জন লোককে (প্রত্যেককে ১০০) টাকা এই শর্তে ঋণ দেয় যে তারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে প্রত্যেকে আসলের সাথে অতিরিক্ত ১০ টাকা সহ ফেরত দিবে। তাহলে নির্দিষ্ট সময় পর ঋণ দাতার টাকার পরিমাণ হবে। {(১০০+১০)১০০} = ১১০১০=১১০০ টাকা। তার সম্পদ বৃদ্ধি পাবে = (১১০০-১০০০ ) = ১০০ টাকা। আপাত দৃষ্টিতে ব্যক্তির সম্পদ ১০০ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১০ জন লোকের সম্পদ কমে তার ১০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। একজনের বৃদ্ধি পেলেও অনেকজনের সম্পদ কমে গেছে। সম্পদ অনেক জনের হাত থেকে একজনের হাতে এসেছে। সম্পদের পরিমাণগত কোন বৃদ্ধি ঘটেনি। একজন অবৈধ সম্পদের মালিক হয়ে ধনী হয়েছে। আর অনেকজন আরও দরিদ্র হয়েছে। তাই সুদের মাধ্যমে সম্পদের প্রকৃত বৃদ্ধি হয় না।

### *যাকাত কিভাবে সম্পদ বৃদ্ধি করে?*

সম্পদশালী অথবা যাকাত প্রদানকারী তার সম্পদের অতিরিক্ত অংশই যাকাত হিসেবে প্রদান করে থাকে। এটা কোন দান নয়; বরং এটা ধনীর সম্পদে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত গরীবের অধিকার। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'আর তাদের (সম্পদশালীদের) সম্পদে প্রার্থী (গরীব) ও বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে।[৪]

কোন ধনবান ব্যক্তি যখন নিসাব অনুযায়ী তার সম্পদের অতিরিক্ত অংশের যাকাত প্রদান করে তখন তার সম্পদ পবিত্র হয়; আর সমাজের দরিদ্র অসহায় মানুষের দারিদ্র্য দূর হয় এতে দরিদ্র

লোকদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। চাহিদা বাড়ার কারণে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য নতুন নতুন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়ে যায়। এর ফলে একদিকে যাকাত গ্রহীতার সংখ্যা কমে যায়, অন্যদিকে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে যাকাতের টাকা আরও লাভ সহকারে যাকাত দাতার হাতে ফিরে আসে। আবার যাকাতের অর্থ একত্রিত করে কাউকে স্বাবলম্বি করা হলে, যেমন কোন ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ করে দিলে সেও পরবর্তীতে যাকাত দাতাদের কাতারে চলে যেতে পারে। ফলে সমাজের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

উপরের কথাগুলো শুধু তত্ত্ব কথা বা কথার কথা নয়। মুসলিম শাসকরা তাদের শাসনামলে উপরের তাত্ত্বিক আলোচনাকেই বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের শাসনামলে যাকাত প্রদানের জন্য কোন লোক খুঁজে পাওয়া যেত না।

সম্পদের পরিচালন যত বৃদ্ধি পাবে, সম্পদ যত বেশি হাতে হাতে ঘুরবে এর দ্বারা উপকারভোগীর সংখ্যা তত বৃদ্ধি পাবে। শহরের বড় বড় অট্টালিকায় কিংবা ঘিঞ্জি পরিবেশে মানুষ বসবাস করতে পারত না। যদি কৃত্রিম উপায়ে বৈদ্যুতিক পাখা বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বাতাসের পরিচালন বৃদ্ধি করা না যেত। প্রতিদিন হাজার হাজার বৈদ্যুতিক পাখা ও এয়ারকন্ডিশনার তৈরি করা হচ্ছে কিন্তু বাতাসের পরিমাণ বায়ুমণ্ডলে যা ছিল তাই রয়ে গেছে। কিন্তু, যেকোন স্থানে একটি বৈদ্যুতিক পাখা লাগিয়ে দিলেই মানুষ এর সুবিধা পাচ্ছে।

সেইরূপ অর্থকে অলস ফেলে রেখে দিলে এর দ্বারা কোন উপকার পাওয়া যাবে না। অর্থের হস্তান্তর বৃদ্ধি করলে উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। সকল জীবের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের ব্যবস্থা করেই আল্লাহ্ তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।

সম্পদের সুষম বণ্টন হলেই দারিদ্র্যতা নিরসন সম্ভব। আর সম্পদের সুষম বণ্টনের প্রধান হাতিয়ার হল যাকাত। মনে রাখতে হবে সুদি ব্যবস্থায় একজনের সম্পদ বৃদ্ধি পায় কিন্তু অনেকের সম্পদ কমে যায়। আর যাকাতের মাধ্যমে সমাজের সকল মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পায়, সকল মানুষই সম্পদশালী হয়।

### *দ্বিতীয় পর্যায়*

### *ধনী কেন যাকাত দিবে?*

যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে দরিদ্রতা দূরীভূত হবে, কিন্তু সম্পদশালীরা কেন যাকাত দিবে? কেন ধনীদের সম্পদে গরীবদের অধিকার আছে বলা হয়েছে?

এই মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর পৃথিবীর কোন সম্পদের মালিক মানুষ বা অন্যকোন জীব নয়। আল্লাহ্ বলেন, 'আর মহাকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই এবং তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'[৫]

এর দ্বারা বুঝায় পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের মালিক আল্লাহ্। মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি বা খলীফা হিসেবে পার্থিব সম্পদের সাময়িক মালিকানা ভোগ করবে। তাই সম্পদের বিলি-বণ্টনও

আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পন্থায় হতে হবে। এক্ষেত্রে কোন মানুষ যদি বলে, পার্থিব যে সম্পদ তার যোগ্যতাবলে অর্জন করেছে তা কেন অন্যকে দিয়ে দিবে? আল্লাহ্ তো অফুরন্ত সম্পদের অধিকারী। তাই আল্লাহ্‌ইতো দরিদ্রদের দরিদ্রতা দূর করে দিতে পারেন?

প্রথমেই বলা হয়েছে, পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ্‌র খলীফা বা প্রতিনিধি। আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিতো আল্লাহ্‌র দায়িত্বই পালন করবে। কোন দেশের রাষ্ট্রদূত অন্যদেশে গিয়ে নিজের রাষ্ট্রের পক্ষে কাজ করে, তার প্রতি অর্পিত মিশন সে সম্পন্ন করে। সেখানে সে নিজের দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। সে সেখানে এমন কোন কথা বলে না বা কাজ করে না যা তার দেশের পররাষ্ট্রনীতি বিরোধী। তদ্রুপ প্রত্যেক মানুষই পৃথিবীতে এক একজন আল্লাহ্‌র দূত। আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে তার প্রতি অর্পিত মিশন সে সম্পন্ন করবে। প্রত্যেক মানুষকেই আল্লাহ্ তাঁর যোগ্যতা অনুসারে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। আর মানুষের যোগ্যতাও আল্লাহ্‌র মহান দান। আল্লাহ্ মানুষের যোগ্যতার মধ্যে তারতম্য করেছেন বলেই পৃথিবীতে ভারসাম্য বিদ্যমান। সবাই সমান যোগ্যতার হলে কেউ কাউকে মান্য করত না। সবাই কর্মকর্তা হলে অধঃস্তন হওয়ার মত কেউ থাকত না। এতে পৃথিবীর সকল কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়ে থাকত, কোন উৎপাদন-উন্নয়ন সম্ভব হত না। পৃথিবীর যাবতীয় উন্নয়নের পিছনে এক শ্রেণীর লোকের মেধা এবং অন্য একশ্রেণীর কায়িক শ্রম রয়েছে। শুধু মেধা বা শুধু শ্রম দিয়ে পৃথিবীতে কোন উন্নয়নই সম্ভব হত না। তাই যোগ্যতা বা মেধা আল্লাহ্‌রই এক মহান দান। একজন অল্প পরিশ্রম করে অধিক আয় করে আর একজন সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও পুরো পরিবারের অন্ন সংস্থান করতে পারে না। এক্ষেত্রে অধিক আয়কারী তাঁর আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ নিম্ন আয়ের লোককে বা যে একদম আয় করতে পারে না তাঁকে দিয়ে দিবে এটাই ইসলাম নির্দেশিত স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এখানে সম্পদ শুধু নিজের প্রয়োজনে কুক্ষিগত করে রাখার সুযোগ নেই।

### *যোগ্যতাই সবকিছু নয়*

যোগ্যতা বা মেধা আল্লাহ্‌ই মানুষকে দিয়েছেন আবার যোগ্যতাই সবকিছু নয়, আমাদের সমাজে বা রাষ্ট্রে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন বা সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদে যারা রয়েছেন তাঁরাই দেশের সবচেয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি সেকথাও বলা যাবে না। কোন দেশের রাষ্ট্রপতি বা প্রধান মন্ত্রী বলতে পারেন না যে, তিনি তার পদের জন্য সেদেশের সবচেয়ে যোগ্য লোক। তাই দেখা যায় Fate বা ভাগ্যের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। আর আল্লাহ্‌ই মানুষের একমাত্র ভাগ্য নির্ধারক, তাই একজন সম্পদশালী কিছুতেই অহংকারী হতে পারবে না এই ভেবে যে, এসব সে নিজ যোগ্যতাবলে অর্জন করেছে, এখানে আর কারও কোন অধিকার নেই।

আল্লাহ্ বলেন, 'আর তাদের (সম্পদশালীদের) সম্পদে প্রার্থী (গরীব) ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।'[৬]

মনে রাখতে হবে, ধনীর সম্পদে আল্লাহ্ দরিদ্রের যে ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন তা থেকে তাকে বঞ্চিত করলে কঠিন আযাবের সম্মুখিন হতে হবে। আল্লাহ সবকিছু ক্ষমা করলেও মানুষের হক

নষ্টকারীকে ক্ষমা করবেন না।[৭] মানুষ শুধু চেষ্টা করতে পারে, ফলাফলতো আল্লাহ্ই নির্ধারণ করবেন।

আমাদের দেশ বিভিন্ন সময়ে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে কিন্তু তারপরেও কিছু লোক অনাহারে থেকেছে, দেশের কিছু এলাকায় 'মঙ্গা'[৮] দেখা দেয়। মঙ্গা বা এই ধরণের খাদ্যাভাব কিন্তু বাজারে খাবারের সংকট রয়েছে বলে হয় এমনটি নয়, বাজারে পর্যাপ্ত খাদ্যের যোগান থাকে কিন্তু কিছু মানুষের কাছে খাদ্য ক্রয়ের অর্থ থাকে না। ফলে তারা খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না।

তাই ধনীরা তাদের সম্পদের যাকাত দিবে কারণ সম্পদ ও আয় বাড়াতে গিয়ে তাদের যে ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে তা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য, নিজেদের সম্পদ আরও বৃদ্ধি করার জন্য এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায়ের জন্য।

আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'স্মরণ কর তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দিব আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।'[৯]

### *যাকাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা*

কুরআন মজিদে যাকাত শব্দটি বারবার উল্লেখিত হয়েছে। একটি সর্বজন পরিচিত শব্দ হিসেবে ত্রিশটি আয়াতে। মাত্র দুটি আয়াতে 'অপরিচিত' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ভিন্ন অর্থে। একটি সূরা কাহাফে, অপরটি সূরা মারয়ামে।

প্রথম ত্রিশটি আয়াতের মধ্যে ২৭টি আয়াতে নামাযের সঙ্গে একত্রিত করে, একটি আয়াতে নামাযের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত হয়েছে আয়াতটি হচ্ছে- 'আর যারা যাকাত দানে সক্রিয়।'

এর পূর্বে রয়েছে, 'যারা তাদের নামাজে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় নিমগ্ন।'

অবশিষ্ট যে ত্রিশটি আয়াতে যাকাত শব্দটি উদ্ধৃত হয়েছে, তন্মধ্যে ৮টি হচ্ছে মক্কী সূরার আয়াত, আর সবকটি মাদানী সূরায় রয়েছে।[১০] নিম্নে পবিত্র কুরআনের যাকাত সম্পর্কীত কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো ঃ

'সম্পদ যেন শুধু তোমাদের ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হতে থাকে।'[১১]

'আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক তাই বৃদ্ধি পায়।'[১২]

'আর তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত প্রদান কর।'[১৩]

'আর যারা স্বর্ণ রৌপ্য জমা করে, অথচ আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে না (অর্থাৎ যাকাত দেয় না, দুস্থদের সাহায্যে ব্যয় করে না) আপনি (হে মুহাম্মদ স.) তাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তির সংবাদ প্রদান করুন। (ঐ সকল ব্যক্তিকে সেদিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিন) যেদিন তাদের সেই সম্পদ (স্বর্ণ-রৌপ্য) দোযখের আগুনে উত্তপ্ত করে সেগুলো দ্বারা তাদের ললাটে, তাদের পাজরে এবং পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। (আর বলা হবে) এই তো সেই সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, এখন তবে সেই সঞ্চিত সম্পদের স্বাদ গ্রহণ কর।[১৪]

*হাদীসের নির্দেশনা*

রসূল স. তার কয়েকটি হাদীসে যাকাত দিতে অস্বীকারকারী লোকদের পরকালীন কঠিন আযাবের ভয় দেখিয়েছেন। এরূপ ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে ধনীদের চেতনা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন এবং লোভী ও স্বার্থপর মানুষকে দানশীল করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন। নিম্নে পরকালীন আযাব ও দুনিয়ার শাস্তি বিষয়ক কয়েকটি হাদীস বিবৃত হল।

*পরকালীন আযাব*

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, নবী করীম স. বলেছেন, আল্লাহ যাকে ধন-মাল দিয়েছেন, সে যদি তার যাকাত আদায় না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তা একটি বিষধর অজগরের (যার দুই চোখের উপর দুটি কালো চিহ্ন রয়েছে) রূপ ধারণ করবে। বলবে, আমিই তোমার ধন-মাল, আমিই তোমার সঞ্চয়। অতঃপর নবী করীম স. এ আয়াতটি পাঠ করলেন, 'যারা আল্লাহর দেয়া ধন-মালে কার্পণ্য করে, তারা যেন মনে করে না যে, তাদের জন্য তা মঙ্গলময় বরং তা তাদের জন্য খুবই খারাপ। তারা যে মাল নিয়ে কার্পণ্য করেছে তা-ই কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি হবে।'[১৫]

ইমাম মুসলিম তারই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। নবী করীম স. ইরশাদ করেছেন, 'স্বর্ণ ও রৌপ্যের যে মালিকই তার উপর ধার্য হক আদায় করে দেবে না, কিয়ামতের দিন সেগুলোকে তার পার্শ্বে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেয়া হবে। পরে তা জাহান্নামের আগুনে তাপ দেয়া হবে এবং সেই উত্তপ্ত বস্তু দ্বারা তার পার্শ্ব, ললাট ও পৃষ্ঠে দাগ দেয়া হবে; সেই দিন যার সময়কাল পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান দীর্ঘ। শেষ পর্যন্ত লোকদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করা হবে। পরে তাকে তার পথ দেখানো হবে। হয় জান্নাতের দিকে নতুবা জাহান্নামের দিকে। গরু বা ছাগলের মালিকও যদি তার উপর ধার্য হক আদায় না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে আসা হবে, সেগুলো নিজেদের দুভাগে বিভক্ত পায়ের খুর দিয়ে মালিককে লাথি মারবে এবং তার শিং দ্বারা তাকে গুতোবে যখনই তার উপর অপরটি এসে যাবে, প্রথমটি প্রত্যাহার করা হবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার বান্দাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন, যে দিনের সময় কাল তোমাদের গণনামতে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। পরে তাকে তার পথ দেখানো হবে, হয় জান্নাতের দিকে, নয় জাহান্নামের দিকে।'[১৬]

*যাকাত না দেয়ায় দুনিয়ার শাস্তি*

রসূল স. বলেছেন, 'যে লোকেরা যাকাত দিতে অস্বীকার করবে, আল্লাহ তাদের কঠিন ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষে নিমজ্জিত করে দেবেন।'[১৭]

*দ্বিতীয় একটি হাদীস*

রসূল স. বলেছেন, ওরা ওদের ধন-মালের যাকাত দিতে অস্বীকার করে আকাশ থেকে বৃষ্টিপাতকে বন্ধ করেছে মাত্র। তারপরও অবশ্য কেবল জন্তু জানোয়ারের কারণেই বৃষ্টিপাত হয়।[১৮]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. সূত্র ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, নবী করিম স. ঘোষণা করেছেন যে, লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ স. সাক্ষ্য দিবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে। তারা যদি তা করে, তাহলে তাদের রক্ত আমার কাছ থেকে নিরাপত্তা পেয়ে গেল, তবে ইসলামের অধিকার আদায়ের জন্য কিছু করার প্রয়োজন হলে ভিন্ন কথা। আর হিসাব নিকাশ গ্রহণ আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন।[১৬]

*যাকাতের নিসাব*

| | *যাকাত দেয়ে সম্পদ* | *যাকাত নির্ধারণের নিসাব* | *যাকাত ধার্যের হার* |
|---|---|---|---|
| ০১. | নগদ বা ব্যাংকে জমা অর্থ; শেয়ার সার্টিফিকেট; বন্ড বা ওই শ্রেণীর ঋণপত্র (আপাত মূল্য বা ফেস ভ্যালু); বছরের মধ্যে প্রাপ্ত জীবন বীমার অর্থ (পরিপক্কতা/ ম্যাচুরিটি বা জীবিতকালীন সুবিধা/ সার্ভাইভাল বেনিফিট বা স্বত্বত্যাগ/ সারেন্ডার করার কারণে); বছরের মধ্যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি/ফাইনাল সেটেলম্যান্ট বা অফেরতযোগ্য উত্তোলন/নন-রিফান্ডেবল উইড্রোয়ালের কারণে পাওয়া প্রবিডেন্ট ফান্ডের অর্থ | ৫২.৫ তোলা রৌপ্যের মূল্য | ২.৫% |
| ০২. | স্বর্ণ রৌপ্য মূল্যবান পাথর, স্বর্ণ বা রৌপ্যের অলঙ্কার | স্বর্ণের ক্ষেত্রে ৭.৫ তোলা; রৌপ্যের ক্ষেত্রে ৫২.৫ তোলা; এবং স্বর্ণ রৌপ্য একত্রে থাকলে ৫২.৫ তোলা রৌপ্যের মূল্য | বাজার দরের মার্কেট ভ্যালু ২.৫% |
| ০৩. | শিল্প বা ব্যবসা-বাণিজ্যের মজুদ (তৈরি পণ্য আধা তৈরি পণ্য ও কাঁচামাল) | ৫২.৫ তোলা রৌপের মূল্য | লিখিতমূল্য (book value বা বাজার মূল্যে market value) ২.৫% যাকাত দাতার পছন্দ মোতাবেক) |
| ০৪. | কৃষিপণ্য | প্রতি ফসলে (per crop) ৫ ওয়াসাক বা ৯৪৮ কিলোগ্রাম | সেচের আওতাবহির্ভূত জমির বেলায় উৎপাদিত পণ্যের ১০% এবং সেচের আওতাভুক্ত জমির বেলায় উৎপাদিত পণ্যের ২০% বা তার মূল্য |

| ০৫. | পশু (ক) ছাগল বা ভেড়া | ৪০টি | (১) ১-৩৯টির মালিকের বেলায় : শূন্য (২) ৪০-১২০টির মালিকের বেলায়: ১টি ছাগল বা ভেড়া (৩) ১২১-২০০টি মালিকের বেলায়: ২টি ছাগল বা ভেড়া (৪) ২০১-৩০০টির মালিকের বেলায়: ৩টি ছাগল বা ভেড়া (৫) পরবর্তী প্রতি পূর্ণ ১০০টির মালিকের বেলায়: ১টি ছাগল বা ভেড়া। |
|---|---|---|---|
| | খ) গরু, মহিষ অন্যান্য গবাদি পশু | ৩০টি | ১) ১-২৯টির মালিকের বেলায় : শূন্য (২) ৩০-৩৯টির মালিকের বেলায়: ১ বছরের বাছুর (৩) ৪০-৫৯টির মালিকের বেলায়: ২ বছরের বাছুর (৪) ৬০ বা ততোধিক মালিকের বেলায়: ১ বছরের বাছুর প্রতি ৩০টির জন্য এবং ২ বছরের বাছুর প্রতি ৪০টির জন্য। |
| ০৬. | খনিজ সম্পদ | যেকোনো পরিমাণ | বাজার মূল্যের (market value)২০% |
| ০৭. | অন্যান্য সম্পদ | শরিয়ত মোতাবেক | শরিয়ত মোতাবেক[২০] |

*চতুর্থ পর্যায়*

*দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্র*

*১. যখন দিবেই, তখন ধনী বানিয়ে দাও*

হযরত উমর ফারুক রা.-এর একটি উক্তি হচ্ছে যে, 'যখন দিবেই, তখন ধনী বানিয়ে দাও, স্বচ্ছল বানিয়ে দাও।'[২১]

হযরত উমর রা. যাকাত দিয়ে দরিদ্র ব্যক্তিকে বাস্তবিকই ধনী ও স্বচ্ছল বানিয়ে দিতেন। সামান্য খাদ্যের ব্যবস্থা করে কিংবা কয়েকটি দিরহাম দিয়ে তার ক্ষুধা বা উপস্থিত প্রয়োজন পূরণ করে ক্ষ্যান্ত হতেন না।

*একটি ঘটনা ঃ* এক ব্যক্তি তার নিকট এসে তার অর্থনৈতিক দুরবস্থার বর্ণনা দিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করলো। তিনি তাকে তিনটি উট দিয়ে দিলেন। এটা ছিল তাকে দারিদ্র থেকে বাঁচানোর জন্য। তিনি যাকাত বণ্টনকারী কর্মচারীদের নির্দেশ দিলেন, যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে বারবার তা বণ্টন কর তাতে এক একজন একশটি করে উট পেয়ে গেলেও ক্ষতি নেই।[২২]

*দারিদ্রের ব্যাপারে তার নীতি ঘোষণা করলেন উদাত্ত কণ্ঠে*

আমি তাদের বারবার যাকাত দেব, তাদের একজন একশটি করে উট পেয়ে গেলেও।[২৩]

তাই যাকাত দানের মূলনীতিই হবে যাকাত গ্রহিতার দারিদ্র্যকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সাময়িক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা নয়। তাই কর্মক্ষম ও অকর্মক্ষম অবস্থা ভেদে দরিদ্রদের ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ার স্বাবলম্বী করার ব্যবস্থা করতে হবে।

### ২. *কর্মক্ষম লোকদের যাকাত প্রদান*

সমাজে অনেক লোক রয়েছে যারা কর্মক্ষম কিন্তু, কোন কাজ করার সুযোগ না পাওয়ার কারণে দরিদ্র। এরা হয়ত কোন ব্যবসা শুরু করতে চায়, কিন্তু অর্থাভাবে শুরু করতে পারছে না। আবার অনেকে কোন না কোন কৌশলী কাজ জানে, কিন্তু অর্থাভাবে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিনতে পারছে না। তাকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করার প্রয়োজনীয় অর্থ যাকাত হিসাবে দিয়ে সারাজীবনের জন্য স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করতে হবে। দরিদ্র কৃষক, যে কৃষি কাজ ভাল জানে কিন্তু তার কোন জমি নেই তাকে যাকাতের অর্থ দ্বারা জমি কিনে দেয়া যাবে। এ ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন হালের বলদ, বীজ, কিটনাশক ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য যাকাতের টাকা প্রদান করা যাবে। এই শ্রেণীর লোকদের একবার স্বাবলম্বী করতে পারলে তারা আর সারাজীবনে যাকাতের দারস্থ্ হবে না; বরং কোন এক সময়ে তারাই আবার যাকাত দাতায় পরিণত হবে। এভাবে যাকাতের অর্থ দ্বারা পেশা নির্বাচনের সুযোগ করে দিতে হবে এবং যে যে পেশায় অভিজ্ঞ তাকে সে পেশায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন বা অর্থ যাকাত ফান্ড থেকে সরবরাহ্ করতে হবে। যেমন, যে লোক সবজি বিক্রয় করতে পারে, তাকে পাঁচশ বা হাজার টাকা আর যে কাপড় বিক্রি করতে পারে তাকে ৩০/৪০ হাজার টাকা দেয়া যেতে পারে।

### ৩. *অকর্মক্ষমদের যাকাত প্রদান*

যারা সমাজে অকর্মক্ষম অর্থাৎ যাদের শারীরিক বা মানসিক যোগ্যতা নেই কোন কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করার, তাদেরকে যাকাত প্রদান করতে হবে। সেই যাকাতের পরিমাণ অবশ্যই তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে সমর্থ হতে হবে। যার প্রয়োজন পূরণে যতটুকু দরকার তাকে সেই পরিমাণ দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী এবং ইরাক ও খোরাসানের বিপুল সংখ্যক ফিকহ্‌বিদ বলেছেন, তাদের এমন পরিমাণ দিতে হবে যা তাদের দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করে স্বাচ্ছন্দ্য ও ধনাঢ্যতার দিকে নিয়ে যেতে পারে অর্থাৎ যা তাদেরকে স্থায়ীভাবে স্বচ্ছলতা দান করবে।[২৪] কারণ যাকাত দানের উদ্দেশ্য হল অকর্মক্ষম লোকদের কারো মুখাপেক্ষিতা থেকে বিমুক্ত করা। এক্ষেত্রে তাদেরকে একবছরের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ দিতে হবে। তবে তারা যাতে অপচয় না করে সেজন্য মাসিক ভিত্তিতেও দেয়া যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, যাকাতের দান অবশ্যই তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হতে হবে। ১৫০ টাকা বা ১৬৫ টাকা হারে মাসিক প্রতিকী ভাতা দিলে চলবে না। এ ক্ষেত্রে নগদ অর্থই দিতে হবে এমন কোন কথা নেই; বরং তাদের এমন জিনিস ক্রয় করে দেয়া যেতে পারে যার আয় থেকে তার প্রয়োজন পূরণ হবে এবং ভবিষ্যতে সে যাকাত গ্রহণ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে।

### ৪. *শিল্প ও কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা*

যাকাতের টাকা একত্রিত করে রাষ্ট্র বা কোন মহৎ উদ্যোগী যাকাত সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান বড় বড় কলকারখানা, খামার ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে, যার মালিক হবে সেখানে কর্মরত

শ্রমিক বা কর্মচারীবৃন্দ। তারা সেখান থেকে বেতন পাবে আবার ব্যবসার লভ্যাংশের ভাগ পাবে। ফলে সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন বা উৎপাদন প্রতিবন্ধক কোন সংগঠনের সৃষ্টি হবে না; বরং নিজের প্রতিষ্ঠান জেনে সকলেই তাদের সর্বোচ্চ শ্রম প্রয়োগ করবে। এতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদিত হবে, এতে দেশের উন্নয়নের চাকা দ্রুত গতিশীল হবে। তবে তারা তাদের প্রতিষ্ঠানের মালিক হলেও তা বিক্রয় করার বা মালিকানা হস্তান্তর করার কোন অধিকার তাদের থাকবে না। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান 'প্রায় ওয়াকফ' সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে স্থায়ী হয়ে থাকবে।

### *৫. ক্ষুদ্র শিল্প বা কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান*

বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে দরিদ্র ও অসহায় মহিলাদের জন্য বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্প বা কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেখানে তারা একই সাথে প্রশিক্ষণ ও কাজের সুযোগ পাবে। গ্রামীণ অসহায় মহিলাদের উন্নয়নের জন্য এ ধরনের প্রকল্প অধিক হারে গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়া গরু, ছাগল এবং মুরগী পালনের ব্যাপারেও সকল ধরনের সাহায্য সহযোগিতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে যাকাত সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান উদ্যোগী হয়ে কাজ করবে ।

### *৬. যাকাতের অর্থ দ্বারা বিয়ের ব্যবস্থা করা*

মানুষের জন্য শুধু পান, আহার, পোশাকই কেবল মৌলিক প্রয়োজন নয়। মানুষের স্বভাবগত প্রয়োজন ও তাগীদ আরও রয়েছে। আর তা হল তার যৌন জীবনের পূর্ণতা সাধন। আল্লাহ পৃথিবীতে তার সৃষ্ট জাতি, প্রজাতি সংরক্ষণ ও বংশ বিস্তারের জন্য যে যৌন চাহিদা দিয়েছেন তা সৎ পন্থায় অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। এই চাহিদা অপূর্ণ থাকলে সমাজে চরম নৈতিক অবক্ষয় ঘটবে। যিনা-ব্যভিচারের মত কদর্য অপরাধ দ্বারা সমাজ কলুষিত হবে। তাই সমাজের উচিত একজন সামর্থ্যবান পুরুষ এবং একজন সামর্থ্যবর্তী নারীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেয়া।

কারণ ইসলাম অবিবাহিত জীবন যাপন, নারীবিহীন অবস্থায় জীবন কাটানো বা পুরুষত্ব হনন-হরণের কাজকে সম্পূর্ন নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। মানুষের যৌন প্রজনন শক্তি দমনের কোন চেষ্টা ভাবধারাকেই ইসলাম আদৌ সমর্থন দেয়নি এবং প্রত্যেক দৈহিক সামর্থ্যবান পুরুষকে বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছে।

***আদেশ হচ্ছে ঃ*** তোমাদের যে কেউ সামর্থ্যবান হবে, সে-ই যেন বিয়ে করে। কেননা এই বিয়েই তার দৃষ্টিকে নত রাখবে এবং যৌন অঙ্গের সংরক্ষণ করবে অতীব উত্তমভাবে।'[২৫]

অতএব, সমাজের বিবাহে ইচ্ছুক (বিবাহক্ষম) নর-নারী মহরানা ও বিয়ের সাধারণ ব্যয় বহন করতে অক্ষম হলে যাকাতের অর্থ দ্বারা তাদের সাহায্য করতে হবে।

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ লোকদের মধ্যে ঘোষণা করতেন কোথায় মিসিকিনরা, কোথায় ঋণগ্রস্ত লোকেরা, কোথায় বিবাহেচ্ছু লোকগণ...। তার এই ডাকের উদ্দেশ্য ছিল এ পর্যায়ের সকল লোকের প্রয়োজন বায়তুল মাল থেকে পূরণ করার ব্যবস্থা করা।

এ সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত একটি হাদীস। এক ব্যক্তি রসূল করীম স.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'আমি আনসার বংশের একটি মেয়ে বিয়ে করেছি'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কত মহরানা নির্দিষ্ট করলে?' বললেন, 'চার আউকিয়া' (৪.৪০ =১৬০ দিরহাম)। নবী স. বললেন, মাত্র চার আউকিয়া? মনে হচ্ছে, তোমরা এই পাহাড়টি ফেলানোর জন্য রৌপ্য খোদাই করছ। এখনতো আমাদের নিকট কিছু নেই। কিন্তু খুব শিগরীরই আমরা তোমাকে এমন প্রতিনিধিত্বে পাঠাব, যাতে তুমি অনেক কিছুই পেয়ে যাবে।"

হাদীসটি থেকে জানা গেল, এই অবস্থায় নবী করীম স.-এর বিরাট দানের কথা লোকদের ভালভাবে জানা ছিল। এ কারণেই তিনি বলেছিলেন, এখন তো আমার নিকট দেয়ার মত কিছু নেই, তবে তোমার জন্য অন্য ব্যবস্থা করা হবে। যা থেকে তুমি প্রচুর পেয়ে যাবে।[২৬]

বিবাহিত জীবন মানুষকে অধিক পরিমাণে দায়িত্বশীল করে, কাজ কর্মে উৎসাহ বৃদ্ধি করে এবং দুইজনের রিযিক এবং ভাগ্য একত্রিত হওয়ায় জীবনে খায়ের বরকত বৃদ্ধি পায়। তাই দারিদ্র বিমোচনের জন্য সক্ষম লোকদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দেয়া অত্যন্ত জরুরী একটি কাজ।

### ৭. *দারিদ্র্য বিমোচনে ওশরের ভূমিকা*

আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেন, 'আর মৃত জমীন তাদের জন্য নিদর্শন। আমরাই তা জীবন্ত করেছি এবং তাতে উৎপন্ন করেছি দানা, শস্য। তা থেকেই তারা খায়। তাতে আমরা বানিয়েছি খেজুরের বাগিচা এবং তার বুকে ঝরনাধারা প্রবাহিত করেছি, যেন তারা তার ফল খেতে পারে আর যা তাদের হস্ত প্রস্তুত করে। ... তোমরা কি শোকর করবে না?[২৭]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ জমীনে শস্য উৎপাদনে তার নিয়ামতের কথা বর্ণনা করেছেন এবং এই সব নিয়ামতের শুকুরিয়া মানুষ আদায় কারবে কিনা তা প্রশ্ন হিসেবে রেখেছেন। আর এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় তখনই হবে যখন উৎপন্ন ফসলের যাকাত আদায় করা হবে। এর দ্বারা মহান আল্লাহ্র একান্ত অনুগ্রহের হক আদায় হবে। সেই সাথে তার সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়া সহানুভূতিও প্রদর্শিত হবে। ইসলামী ফিকহ্-এ এই যাকাতকে 'ওশর' নামে অভিহিত করা হয়েছে অথবা ফল ও ফসলের যাকাতও বলা হয়।

রসূল স. সুস্পষ্ট হাদীসের মাধ্যমে ওশরের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

***ক. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম স. বলেছেন ঃ*** বৃষ্টি ও খাল-নদীর পানিতে যে জমি সিক্ত হয় অথবা যা মাটির রসে সারাদিন সিক্ত থাকে, তাতে দেয়া হচ্ছে ফসলের এক দশমাংশ। আর যাতে সেচ কাজ করতে হয়, তাতে অর্ধ ওশর বা বিশভাগের একভাগ।[২৮]

***খ. হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত ঃ*** নবী করিম স.-এর কথা, 'যা খাল নদী ও মেঘের পানিতে সিক্ত হয়, তাতে ওশর ধার্য হয়েছে। আর যা সেচের মাধ্যমে সিক্ত হয়, তাতে অর্ধ ওশর।'[২৯]

### *'ওশর' যেভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করে*

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, ওশর হল জমির ফসলের যাকাত এবং দেশের সরকার সেই যাকাত গ্রহণ করবে। দেশের দারিদ্র্য বিমোচন বা দরিদ্র লোকদের দেখা-শুনা করার গুরুভার যেহেতু

সরকারের উপর, সেহেতু সরকার জমির ফসল সংগ্রহ করে গুদামজাত করবে এবং এর প্রাপ্য লোকদের মধ্যে বণ্টন করবে। এক্ষেত্রে আমাদের জানতে হবে এর প্রাপক কারা হবে। যারা যাকাতের প্রাপক তারাই ওশরের প্রাপক হবে। যাকাতের থেকে ওশরের সুবিধা হল যাকাতের ক্ষেত্রে সাধারণত নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকতে হয় কিন্তু ওশরের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জরুরী নয়, আর ওশরের মাধ্যমে সরাসরি খাদ্যশস্য বা কৃষিজাত পণ্য সরকারের আয়ত্তে চলে আসে। ফলে সরকারের পক্ষে যে কোন জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করা সহজ হয়। যে কোন জরুরী পরিস্থিতিতে সরকার সরাসরি খাদ্য সাহায্য দিতে পারে। আর দরিদ্র লোকেরা সরাসরি খাদ্যদ্রব্য পাওয়ার ফলে তাদের খাদ্যাভাবের দ্রুত সমাধান হয়। বাংলাদেশে বছরের নির্দিষ্ট একটি সময় নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। খাদ্যাভাবের মূল কারণ অর্থাভাব। সেখানে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের কোন কাজ থাকে না ফলে তারা খাদ্য কিনতে পারে না। এক্ষেত্রে ওশরের মাধ্যমে সংগৃহীত খাদ্য শস্য বিতরণের মাধ্যমে খাদ্যাভাব দূর করা যায়। এই খাদ্য অবশ্যই পুরো সংকটকালীন সময়ে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করতে হবে। আমাদের দেশের জমি অত্যন্ত উর্বর এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনও প্রাকৃতিক নিয়মেই খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয়। তাই জমির মালিক যদি যথানিয়মে ওশর প্রদান করে তবে ওশর আদায়ের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ কৃষিজাত দ্রব্য সংগৃহীত হতে পারে। আর যে সব জায়গায় কৃত্রিম সেচের মাধ্যমে চাষাবাদ হয় সেখান থেকেও অর্ধ ওশর বা বিশ ভাগের একভাগ আদায় করা শরীয়তের বিধান রয়েছে।

ওশরের সবচেয়ে বড় সুফল হল যে, প্রয়োজনে সরাসরি পণ্য সরবরাহ করা যায় আবার খুব তাড়াতাড়ি পণ্যকে অর্থে রূপান্তরিত করা যায়।

বর্তমানে আমাদের দেশে বয়স্কভাতা ও বিধবা ভাতা চালু রয়েছে। এই ভাতার আওতায় যা দেয়া হয়, তা নিতান্তই সামান্য, যাকে প্রতিকী অনুদান বলা যেতে পারে। এর দ্বারা তাদের কোন মৌলিক প্রয়োজন পূরণই সম্ভব নয়। তাদের এই দানের ক্ষেত্রে ওশর ভূমিকা রাখতে পারে। ওশরের মাধ্যমে সংগৃহীত খাদ্যশস্য তাদের মধ্যে তাদের জীবন-ধারণ উপযোগী পর্যাপ্ত পরিমাণে দেয়া যেতে পারে। এর দ্বারা ভিক্ষা বৃত্তি বন্ধ হবে এবং কাজের অভাবে মানুষের শহরমুখী হওয়া কমে যাবে।

কৃষি জমিতে কাজ করে কম পারিশ্রমিক পাওয়া যায় বলে জমিতে কাজ করার জন্য শ্রমিক পাওয়া আজকাল দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে যেহেতু রাষ্ট্রীয়ভাবে ওশর সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা নেই সেক্ষেত্রে জমির মালিকরা যদি নিজেদের ইচ্ছায় তাদের ফসলের শরীয়ত সম্মত ওশর নির্ধারণ করে জমিতে কর্মরত গরীব শ্রমিক এবং সমাজের অন্যান্য অসহায়দের মধ্যে বিলি বণ্টন করে তাহলে শ্রমিকরা জমিতে কাজ করার জন্য উৎসাহ পাবে। তারা আন্তরিকতার সাথে ফসলের যত্ন নিবে কারণ এর অংশীদার তারাও রয়েছে। এক্ষেত্রে ওশরের মাধ্যমে তাদের মজুরী পরিশোধ করা যাবে না। মজুরী আলাদা দিতে হবে এবং ওশরের নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করা যাবে না। শরীয়ত সম্মতভাবে নির্ধারিত অংশ দিতে হবে। অর্থাৎ জমিতে কাজ করলে অতিরিক্ত পাঁচ কেজি

ধান বা চাল দেয়া হবে এভাবে নির্ধারণ করা যাবে না; বরং জমিতে উৎপাদিত ফসলের ১/১০ অংশ বা ১/২০ অংশ দেয়া হবে বলতে হবে। শ্রমিকদের আন্তরিকতার কারণে এক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং ফসল আহরণের সময় ফসলের অপচয় এবং ফসল বিনষ্ট কম হবে।

*উপসংহার*

আল্লাহ্ তার সৃষ্ট মাখলুকাত যে ভূখণ্ডে পাঠিয়েছেন সেখানে তাদের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের ব্যবস্থা করেই পাঠিয়েছেন। তাই সম্পদের অভাব হওয়ার কোন কারণ নেই। যা হয় তা হল সম্পদের বণ্টন সুষম হয় না। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে যে দায়িত্ব পালন করার কথা তা সকলে সঠিকভাবে করছে না বলেই যাবতীয় সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য মানব রচিত যত কৌশলপত্রই তৈরি করা হোক না কেন তা দ্বারা দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ বর্ণিত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র প্রতিষ্ঠা না হবে।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, যাকাত যখন কাউকে দেয়া হবে তখন তা পর্যাপ্ত পরিমাণে দিতে হবে অর্থাৎ তার প্রয়োজন পূরণ করে দিতে হবে। কারণ যাকাতের উদ্দেশ্যই হল যাকাত প্রার্থীতে পুনর্বাসিত করা, তার দারিদ্র্যকে চিরতরে দূর করে দেয়ার প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা। যাকাত দিতে হবে পুরোপুরি সম্পদের হিসেব করে। হিসেব ছাড়া অধিক পরিমাণে দিলেও যাকাত আদায় হবে না। বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ হিসাবে পরিচিত হলেও এদেশের যাকাত ওয়াজিব যোগ্য লোকের সংখ্যা কম নয়। সম্পদশালীরা তাদের সম্পদের ন্যায্য যাকাত আদায় করলে যাকাত প্রার্থীদের পর্যাপ্ত পরিমাণ যাকাত প্রদান সম্ভব হবে। এতে দেশের দরিদ্রতা দ্রুত হ্রাস পাবে এবং এর সুফল পুরো জাতি উপভোগ করবে। আমাদের দেশের প্রধান সমস্যাগুলো দারিদ্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই এর একটি টেকসই সুরাহা করতে পারলেই আমাদের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হবে।

*তথ্যসূত্র :*

১. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান (অনুঃ মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৫, খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৩ ইং।
২. প্রাগুক্ত।
৩. আল-কুরআন, সূরা আর্ রূম, আয়াত ৩৯।
৪. আল-কুরআন, সূরা আল-যারিয়াত, আয়াত ১৯।
৫. আল-কুরআন, সূরা আন্-নূর, আয়াত ৪২।
৬. আল-কুরআন, সূরা আল-যারিয়াত, আয়াত ১৯।
৭. রসূল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে (কারও) এক বিঘত জমীন গ্রহণ করেছে, কিয়ামতের দিন তার সাত তবক যমীন তার ঘাড়ে শিকলরূপে পরিয়ে দেয়া হবে। মেশকাত শরীফ, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৪।
৮. দেশের উত্তারাঞ্চলের কোন কোন জেলায় একটি নির্দিষ্ট মৌসুমে সাধারণ কর্মজীবিদের হাতে কোন

কাজ থাকে না, ফলে তারা অর্থাভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্য ক্রয় করতে পারে না এবং সাময়িক অভাবের মধ্যে পতিত হয়।

৯. আল-কুরআন, সূরা-ইবরাহীম, আয়াত ০৭।
১০. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০।
১১. আল-কুরআন, সূরা আল-হাশর,আয়াত ৭।
১২. আল-কুরআন, সূরা আর-রূম,আয়াত ৩৯।
১৩. আল-কুরআন, সূরা আল মুজাম্মিল, আয়াত ২।
১৪. আল-কুরআন, সূরা- আত-তাওবা, আয়াত ৩৪-৩৫।
১৫. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী র., মেশকাত শরীফ, ৪র্থ খণ্ড, এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লিঃ, ঢাকা, ২০০৬ ইং, হাদীস নং- ১৬৮২(৩), পৃষ্ঠা ১২৬।
১৬. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৬৮১(২), পৃষ্ঠা ১২৪।
১৭. হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সিকাহ্, হাকেম এবং বায়হাকীতে হাদীসটি উদ্বৃত হয়েছে।
১৮. ইবনে মাজা, বাজ্জার, বায়হাকী।
১৯. ইমাম বুখারী মুসলিম, এবং নাসায়ী এ হাদীসটি নিজ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।
২০. সূত্রঃ যাকাত বোর্ড, ধর্ম মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞপ্তি নং এস,আর, ও ৩৩২-এল/৮৩ তাং ২৪-০৮-১৯৮৩ এবং পাকিস্তানের যাকাত আইন মোতাবেক। (দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২১.১০.২০০৫)।
২১. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪।
২২. প্রাগুক্ত।
২৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫।
২৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪২।
২৫. বুখারী , কিতাবুস সাওম।
২৬. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৭।
২৭. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী (রঃ), মিশকাত শরীফ ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং- ১৭০৫(৪), পৃষ্ঠা ১৩৯।
২৮. আহমদ, মুসলিম।

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৮
বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৩, পৃষ্ঠা : ৩১-৫৮

# নারী অধিকার রক্ষায় ইসলামের উত্তরাধিকার আইন

জাফর আহমাদ

## ভূমিকা

'নারী অধিকার' বিষয়টি নিয়ে সারা পৃথিবী আজ সরব হয়ে উঠেছে। সভা-সমিতি, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম 'নারী অধিকার' আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক অধিকারের ক্ষেত্রে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার কোন কমতি নেই। এ সব আলোচনায় সমালোচিত হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মের অধিকারের আওতার বিষয়টিও। যারা আজ মিডিয়ায় অত্যন্ত শক্তিশালী তারা এ ব্যাপারে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। সন্দেহ নেই সারা পৃথিবীতে ইসলামী মিডিয়া এতটাই দুর্বল যে ইসলামে নারী অধিকারের অনন্য অতুলনীয় বিষয়গুলো অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরেই উচ্চারিত হয়। ইসলামে নারী অধিকার নিয়ে বিশ্ব মিডিয়ায় যে পরিমাণ বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে তার চেয়েও বেশি বিভ্রান্তিতে আছে মুসলামান সমাজ। এর প্রকৃত কারণ পর্যাপ্ত ইসলামী জ্ঞানের অভাব। বিশেষ করে বর্তমান মুসলিম সমাজ পরিপূর্ণ ইসলামী আইনের বাস্তব প্রয়োগ দেখেনি বিধায় এ ব্যাপারে জানার আগ্রহ উদ্দীপনা খুবই সীমিত। তাই হীনমন্যতা ও অবনতিশীল মানসিকতা মুসলিম সমাজকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ পশ্চিমা বিশ্বের সাথে স্বর মিলিয়ে মুসলমানরাও কথা বলে। প্রকৃতপক্ষে 'নারী অধিকার' বিষয়ে ইসলামের সাথে পৃথিবীর অন্যান্য মতবাদের তুলনাই চলে না। কেউ মানুক আর না মানুক ইসলাম নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক অধিকার প্রদান করে যতটুকু আবর্জনাপূর্ণ গভীর খাদ থেকে তাকে উদ্ধার করেছে এবং তাকে মর্যাদার সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আসীন করেছে, ভোগবাদী পৃথিবীর বিভিন্ন মতবাদ নারী অধিকারের নাম করে নারীকে ঠিক ততটুকুই বা ক্ষেত্র বিশেষে তার চেয়েও বেশি ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে। ইসলামের উত্তরাধিকার আইনটির সফল বাস্ত বায়ন হলে নারীর অধিকারের সুফল আমরা স্বচক্ষে দেখতে পেতাম। আল্লাহর এ বিধানটির সঠিক প্রয়োগ ঘটুক এবং মুসলিম নারী সমাজ আর্থ-সামাজিক পথে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠুক। এবং এ থেকে সারা বিশ্বের নারী সমাজ খুঁজে পাক আত্মনিয়ন্ত্রণ ও যথাযথ মর্যাদা।

## ১. নারী অধিকার

মানব সভ্যতা বিকাশে নারীর অবদান ও কৃতিত্বকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। কারণ মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। তাদের বাদ দিয়ে সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক উন্নয়ন তথা

লেখক : গবেষক, প্রাবন্ধিক, প্রিন্সিপাল অফিসার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ।

মানবোন্নয়নের কোনটিরই কল্পনা করা যায় না। একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, 'নারীর হাতে সভ্যতার দুর্গ।' অতি কষ্টে তারা মানব জাতিকে ধারণ করেন। তাদের এই পরিশ্রম ও কষ্টকে অর্থ দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। ইসলামে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ কিংবা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে বাড়ির বাইরে যাওয়ার অনুমতি আছে। বাড়ির বাইরে যেতে হবে বলেই হিজাবের বিধান দেয়া হয়েছে। তবে পশ্চিমাদের মতো নারী উন্নয়নের মোড়কে নারীকে পণ্যে পরিণত করা মোটেও কোন সভ্য মানুষের কাম্য হতে পারে না। যে সভ্যতা নারীকে লাল পানিয়ের মতই ভোগের উপকরণ হিসাবে জমকালো ডাইনিং টেবিলের পাত্রে সাজিয়ে রাখে। যারা নারীকে জোর করে প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে। ব্যাপারটি অনেকটা সুসভ্য সুশ্রী কোন মানুষকে বিকৃত অসভ্য জংলীদের আখড়ায় ঠেলে দেয়ার মত। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। ভাঙ্গছে ঘর, ভাঙ্গছে পরিবার, আরো ভাঙ্গছে সমাজ ব্যবস্থা আর ভবিষ্যত বংশধারা। চিলির নোবেল বিজয়ী কবি জেব্রিয়েলা মিস্ট্রালের কণ্ঠে আমরা এরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই : 'We are guilty of many errors and many faults but our worst crime is abandoning the children, neglecting the fountain of life. Many of the things we need can wait, the child cannot. Right now is the time his bones are being formed his blood is being made and his senses are being developed. To him we cannot answer tommorrow. His name is today. অর্থাৎ 'আমরা অনেক দোষেই দোষী। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় অন্যায় হচ্ছে শিশুদের ত্যাগ করা, তাদের জীবনের স্রোতধারাকে অস্বীকার করা। অনেক কিছুর জন্যই অপেক্ষা করা যায়, কিন্তু শিশুর জন্য নয়। এখনই তার গড়ে ওঠার সময়। তার কাছে আগামীকাল বলে কিছু বলা যাবে না। বর্তমানই তার নাম।'

সম্প্রতি লস এঞ্জেলস্ টাইমস্ এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে ঠিক একই আশংকা ব্যক্ত করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ চিকিৎসক ও খ্যাতিমান শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. টি বেবী ব্রাজেলটন : 'My own feeling is that we have pushed women too far. We have split them in two and we have not given them back anything to support themselve on either end. I just think our country is in deep deep trouble' অর্থাৎ 'আমার নিজের অনুভূতি, আমরা মেয়েদের অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছি। দু'কুল রক্ষার জন্য আমরা তাদের কিছুই দেইনি। আমি মনে করি, আমাদের দেশ গভীর থেকে গভীর সংকটে নিপতিত হয়েছে।'

ডাঃ ব্রাজেলটন ৮০ বছর বয়সী একজন প্রধান শিশু চিকিৎসক। তিনি অত্যন্ত কাছে থেকে দেখেছেন মায়েদের অবহেলা কিভাবে শিশুদের জীবনী শক্তিকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তিনি আরো দেখেছেন কিভাবে মার্কিন মহিলারা জীবিকার জন্য শ্রম বাজারের দিকে দৌড়াচ্ছে এবং পরিবারের ভাঙ্গন মার্কিন শিশুদের কি ক্ষতি করছে। সত্যিই সার্বিক অর্থনৈতিক মুক্তির নামে তারা মেয়েদের মায়ের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে, যেমন মুক্তি মার্কিন মহিলারা পেয়েছেন এবং তাদের সন্তানেরা

আস্তাকুঁড়ের কীটে পরিণত হচ্ছে। 'নদী বিশেষজ্ঞদের হুঁশিয়ারী হচ্ছে, নদী নিয়ে খেলবেন না, আপনি জানেন না, এক দিকে নদী বাঁধ দিয়ে এক হাজার একর উদ্ধার করলে অন্যস্থানে সে পাঁচ হাজার একর নিয়ে যেতে পারে। নদী থেকে সহস্র গুণ জটিল সমাজ ও সামাজিক প্রক্রিয়া। সমাজ নিয়ে খেলে পাশ্চাত্য এখন ডুকরে কেঁদে মরে।'[১]

মূলত মানব সভ্যতার কারিগর নারীকে তার উপযুক্ত জায়গায় স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়ার নামই নারীর অধিকার। মনে রাখা প্রয়োজন, এটি এমন একটি জায়গা যেটিকে পরিচালনা করার বিকল্প হিসাবে পুরুষ বা অন্য কোন কৃত্রিম কিছুর চিন্তা করা বোকামী। নারীকে জোর করে এমন এক অন্ধকার, অচেনা, অজানা কর্মক্ষেত্রে নিয়ে আসা হয়েছে, যেখানকার পরিবেশ নারীর প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী। ফলে বিশ্বের মানব সভ্যতা আজ চরম হুমকীর সম্মুখীন।

মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত থেকে উদ্ধারের লক্ষে নারীকে তার নিজস্ব কর্মস্থলে ফিরিয়ে আনতে হবে। নারীর আর্থিক দিকটি পাশ্চাত্যের মতো চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। বরং মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের জন্য নিশ্চিত আর্থিক ব্যবস্থা করে রেখেছেন, সেটিই অতীব উত্তম পন্থা। প্রথমত তিনি স্বামীর ওপর মোহরানা ফরয করেছেন, যা স্থায়ী আমানত হিসাবে স্ত্রীর কাছে থাকবে। এটি ব্যয় করার জন্য তাকে কেউ বাধ্য করতে পারে না। তার দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্বামীকে ভরণ-পোষণে বাধ্য করা হয়েছে। স্বামীর সম্পত্তি হেফাজতের সাথে সাথে তা ভোগ-ব্যবহারের অধিকার তো আছেই। দ্বিতীয়ত, নারী মাত্রই মৃত পিতা-মাতা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে ও স্বামীর সম্পত্তির অংশ পায়। আমাদের সমাজ সংসারে নারীর সার্বিক অধিকারের সুফল দেখতে হলে ইসলামে নারীর অর্থ সম্পর্কিত আইন ও অধিকার বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ একান্ত জরুরী। এছাড়া নারী অধিকার নিয়ে বিশ্ব যতই হই হুল্লোড় করুক না কেন, নারী তার সুষম শান্তি দায়ক সার্বিক অধিকার কখনো ফিরে পাবে না।

## ২. *একটি অভিযোগ খণ্ডন*

ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের ভেতরে প্রবেশ করার আগেই একটি অভিযোগ খণ্ডন করতে চাই। পশ্চিমা বিশ্ব ছাড়াও আমাদের দেশের মুসলিম নামধারী কিছু জ্ঞানপাপী এ অভিযোগ প্রায়ই উত্থাপন করে থাকে। অভিযোগটি হলোঃ 'ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে নারীদের অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে। পুত্রকে কন্যার দ্বিগুণ দেয়া হয়েছে।' যারা এ ধরনের অভিযোগ নিয়ে আসেন, তাদেরকে প্রথমেই জাহিলিয়াতের নারীর অবস্থান এবং ইসলামের সোনালী যুগের নারীদের অবস্থানের তুলনামূলক পর্যালোচনা করার অনুরোধ করবো। দ্বিতীয়ত ইসলামের মিরাস বণ্টনের পুরো নীতিমালাটুকু একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের অনুরোধ করবো। অভিযোগকারীদের সংক্ষেপে উত্তর দেয়ার পরও জাহেলি যুগে নারীর অধিকারের বাস্তব কিছু চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। এ দুটি বিষয় ছাড়াও তাদের জ্ঞাতার্থে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের নারীর মীরাসী আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনাও পেশ করা হয়েছে। এ আলোচনার মাধ্যমে 'নারীর অধিকার রক্ষায় ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের প্রয়োগ' শিরোনামে বর্ণিত বিষয়টিও আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হবে। ইনশাআল্লাহ।

### ৩. জাহেলি যুগে নারীর আর্থিক অধিকার

জাহেলি যুগে ইয়াতীম মেয়ে ও বিধবাদের অবস্থা খুবই করুণ ও মারাত্মক ছিল। অভিভাবকরা তাদের সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করতো। ইয়াতিম মেয়েদের ভাল সম্পদকে খারাপ সম্পদের সাথে বদল করে নিত এ ভয়ে যে, বড় হয়ে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে নেবে। উপরন্ত ধন-সম্পদের লোভে অভিভাবকরা ছোট ছোট ইয়াতিম মেয়েদেরকে বিয়ে করার মানসে তাদের ঘরে আটকে রাখতো। কোন আন্তরিকতার বশবর্তী হয়ে নয় বরং ইয়াতীম মেয়েদের সম্পদ কুক্ষীগত করার হীন মানসিকতার উদ্দেশ্যেই তা করা হতো। মহিলাদেরকে মীরাসের অংশ দেয়া হতো না। বরং শক্তিশালী ছেলে ওয়ারিশদার যে খুব বীরত্ব প্রদর্শন করতে পারতো, যুদ্ধক্ষেত্রে যে অশ্ব ও অস্ত্র পরিচালনায় পারদর্শী, তাকেই মীরাসের সিংহভাগ দেয়া হতো। দুর্বল-অসহায় মেয়ে ওয়ারিশদারকে বঞ্চিত করা হতো। এ ভাবে নারী জাতিকে সে সমাজ মর্যাদার আসনে আসীন করেনি বরং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের সাথে অন্যায় ও অবিচার করা হতো।

যখন কোন মহিলার স্বামী মারা যেতো, তখন তার অভিভাবক তার কাছে আসত এবং তার ওপর তার কাপড় নিক্ষেপ করতো এবং সে এটা ভাল করেই জানতো যে এ মহিলা নিশ্চিতভাবে তারই জন্য গচ্ছিতা ও রক্ষীতা হয়ে গেলো, সে ইচ্ছা করলে তাকে মোহর ছাড়াই বিয়ে করতে পারতো অথবা তাকে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে তার মোহর সে কুক্ষিগত করতে পারতো কিংবা স্বামী তাকে তালাক দেয়ার পর তাকে অন্যত্র বিয়ে বসা থেকে বলপূর্বক বিরত রেখে তাকে এমন অবস্থায় রাখতো যেখানে তাকে স্ত্রী বুঝা যেতো না, আবার তালাক প্রাপ্তাও বুঝা যেতো না। টাকা দিয়ে নিজেকে স্বামীর বন্ধন থেকে মুক্ত করার পূর্ব পর্যন্ত কথিত স্বামী তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখতো। সম্পদের লোভে স্বীয় ইচ্ছামতো যত খুশি স্ত্রী গ্রহণ করতো আবার যে কোন মুহূর্তে তালাক দিয়ে দিতো। এভাবে নারী জাতির মর্যাদার অধপতনের কারণে জাহেলিয়াতের পারিবারিক বন্ধনও নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। এ হলো জাহেলিয়াতের নারী অধিকারের খণ্ড চিত্র। আর এ জগদ্দল পাথর মানুষের মন ও মানসে এমনভাবে চেপে বসেছিল যে ইসলাম আসার পরও তাদের বিশ্বাসে এ প্রশ্ন থেকেই গিয়েছিল যে, মেয়েরাও কি মীরাস পেতে পারে? যেমন আল্লাহ যখন ঘোষণা করলেন, 'আল্লাহ তাআলা তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন, একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান।'[২] তখন অনেকে তার প্রতিবাদ করেন। 'আল আউফি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, যখন আল্লাহর নবী এই আয়াতের মাধ্যমে পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষ, নারী ও পিতা-মাতার অংশ বর্ণনা করেন তখন সাহাবীরা অথবা তাদের মধ্যে কেউ কেউ তা অপছন্দ করেন এবং বলেন, নারীকে চারের এক অথবা আটের এক, মেয়েকে দুয়ের এক এমনিভাবে ছোট শিশুকেও পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ দেয়া হচ্ছে, অথচ তাদের কেউ জেহাদে অংশ গ্রহণ করে না। তারা কিভাবে মালের অংশ পেতে পারে? অতএব, তোমরা পরিত্যক্ত সম্পত্তির বণ্টন সম্পর্কে চুপ থাকো, কোন কথা বলো না, সম্ভবত রসূল স. তা ভুলে যাবেন অথবা আমরা তাঁকে তা পরিবর্তন করার জন্য বলব। অতপর তারা রসূলের স. কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহর

রসূল! পিতার মৃত্যুর পর মেয়ে যদি একজন হয় তাকে অর্ধেক সম্পত্তি দেয়া হয় অথচ সে অশ্বারোহণ করে যুদ্ধের মাঠে জেহাদের অংশ গ্রহণ করে না। একইভাবে শিশুকেও মীরাস দেয়া হয়, যে কোন কাজেই আসে না। ইবনে হাতীম ইবনে জারীর উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।'[৩]
ইসলামের মীরাসী আইন নাযিল হওয়ার পূর্বে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করতো। নারীগণের কোন মীরাস ছিল না। পুরুষ উত্তরাধিকারীগণ সমানভাবে অংশ পেত। নিম্নতম বা বংশধরদের মধ্যে পুরুষ থাকলে উর্ধতন বা পূর্বপুরুষেরা কোন অংশ পেত না। বিবাহ সূত্রের কোন আত্মীয়-স্বজন কোন মীরাস পেত না। ইসলাম এসে নিস্পেষিত নারী সমাজকে উদ্ধার করে। ইসলাম এ নির্দেশ জারী করে সবার জন্যে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। বলা হয় যে, উত্তরাধিকারী সবাই হবে, প্রকৃত আত্মীয়তাই হোক বা বিবাহ বন্ধনের কারণেই হোক বা আযাদী সম্পর্কীয় কারণেই হোক না কেন, অংশ সবাই পাবে-অংশ কম হোক আর বেশি হোক। আল কুরআনের সূরা নিসায় নারীর আর্থিক অধিকার প্রদানসহ তাদের মর্যাদাকে সমোন্নত করা হয়েছে। সূরাটির নামকরণই হয়েছে 'সুরাতুন নিসা', মানে নারী বিষয়ক সূরা।
মহান আল্লাহ তাআলা সূরা নিসার ৭, ১১-১৪, ৩৩ ও ১৭৬ নং আয়াতসমূহে মৃত ব্যক্তির স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের উত্তরাধিকার ও তাদের অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।
সেখানে মহিলাদের অংশও নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। যা অন্য কোন মতবাদ বা ধর্মে পরিলক্ষিত হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মা-বাপ ও আত্মীয়-স্বজনরা যে ধন-সম্পত্তি রেখে গেছে তাতে পুরুষদের অংশ রয়েছে। আর মেয়েদেরও অংশ রয়েছে সেই সম্পত্তিতে, যা মা-বাপ ও আত্মীয়-স্বজনরা রেখে গেছে, তা সামান্য হোক বা বেশি এবং এ অংশ (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নির্ধারিত।[৪]
এটি হচ্ছে মিরাসী আইনের সাধারণ মৌলিক কথা। এ নীতির মাধ্যমে ইসলাম নারীদের জন্য পুরুষের মতোই উত্তরাধিকার নিশ্চিত করেছে।

### ৪. *বিভিন্ন ধর্মে নারীর ওয়ারিসী স্বত্ব*

ইসলামের মিরাসী আইনে নারীকে সম্পত্তির যে অধিকার প্রদান করা হয়েছে, সে আলোচনায় যাওয়ার আগে পৃথিবীর অন্যান্য মতবাদ বা ধর্মে নারীর উত্তরাধিকার আইন পর্যালোচনা না করলে ইসলামে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় উত্তরাধিকার আইনের অবদান কতটুকু তা বুঝা যাবে না। ইসলামের আগমন পূর্ব জাহেলিয়াতে নারীর উত্তরাধিকার অবস্থার বর্ণনা তো আগেই দেয়া হয়েছে। হিন্দু আইনের প্রধান উৎস হলো বেদ, স্মৃতি ও প্রথা। অর্থাৎ যে সকল রীতি-নীতি হিন্দু পরিবার অথবা কোন অঞ্চলে দীর্ঘদিন যাবত প্রচলিত ছিল, সেগুলো হিন্দু আইনে পরিণত হয়েছে। প্রিভি কাউন্সিলে কালেক্টর মাদুরা বনাম মন্টুরাম মামলায় বিচারক বলেছিলেন, 'Clear proff of usage will outweight the written text of Hindu law.' অর্থাৎ প্রথা নিঃসন্দেহে বিধিবদ্ধ হিন্দু আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।'
হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে প্রধানত দুটি আইন চালু রয়েছে। যথা- ১) মিতাক্ষরা পদ্ধতি ২) দায়ভাগ পদ্ধতি।

*মিতক্ষরা পদ্ধতি*

হিন্দু ওয়ারিসীস্বত্ব আইন বিষয়ক একটি গ্রন্থের নাম মিতক্ষরা। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞানেশ্বর কর্তৃক এটি রচিত। এ আইন বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবংগ ব্যতীত প্রায় সমগ্র ভারতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। এ আইনে যৌথ পরিবারে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করা মাত্রই পারিবারিক সম্পত্তিতে উত্তরজীবী সূত্রে অংশীদার হয়। তাই এ আইনে পিতা, পুত্র ও পৌত্র একই সংগে উত্তরাধিকারী হতে পারে। মিতক্ষরা পদ্ধতিতে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী রক্তের নিকটতম সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ণিত হয়। এ আইনে তিন শ্রেণীর উত্তরাধিকারী রয়েছে। যথা- ১) গোত্রজ সপিণ্ড, ২) সমানোদক ও ৩) বন্ধু।

গোত্রজ সপিণ্ডের উত্তরাধিকারীগণের সংখ্যা মোট ৫৭ জন। সংক্ষিপ্তভাবে তাদের একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো-

১. পুরুষের দিক থেকে মৃত ব্যক্তির ছয়টি অধঃস্তন পুরুষ - ৬ জন।
২. পুরুষের দিক থেকে মৃত ব্যক্তির ছয়টি উর্ধতন পুরুষ - ৬ জন।
৩. উপরোক্ত উর্ধতন পুরুষের পত্নীগণ - ৬ জন।
৪. উপরোক্ত ৬টি উর্ধতন পুরুষের প্রত্যেকের পুরুষ বংশ ধারায় ৬টি অধঃস্তন পুরুষ - ৩৬ জন।
৫. বিধবা, কন্যা ও কন্যার পুত্র - ৩ জন।

মোট = ৫৭ জন।

উল্লেখ্য, গোত্রজ সপিণ্ডের কেউ জীবিত না থাকলে সমানোদক ও বন্ধুগণ উত্তরাধিকারী হবে। আবার সমানোদক শ্রেণীর কেউ বেঁচে না থাকলে বন্ধুগণ উত্তরাধিকারী হবে। প্রথম শ্রেণীর কেউ না কেউ বেঁচে থাকতে পারে, তাই ২য় ও ৩য় শ্রেণীর উত্তরাধিকারী হওয়ার সম্ভবনা খুবই ক্ষীণ। সুতরাং ২য় ও ৩য় শ্রেণীর বর্ণনা অনেকটা বেহুদাই হবে।

*দায়ভাগ পদ্ধতি*

মিতাক্ষরার মতই দায়ভাগ একটি হিন্দু ওয়ারিসীস্বত্ব আইন বিষয়ক গ্রন্থের নাম। এটি জীমূতবাহন কর্তৃক রচিত। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবংগ, ত্রিপুরা, আসাম ও মনিপুর প্রদেশের হিন্দু সমাজে এ আইন প্রচলিত। এ আইনে উত্তরাধিকারী হবার জন্যে পিণ্ডদান শর্ত।

যারা পিণ্ডদান করে তাদেরকে সপিণ্ড বলে। মৃত ব্যক্তির পিতৃকুলের এবং মাতৃকুলের উর্ধ্বতন এবং নিম্নতম তিন পুরুষদেরকে বলা হয় সপিণ্ড। দায়ভাগ আইন অনুয়ায়ী তিন শ্রেণীর লোক মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। যথা- ১) সপিণ্ড, ২) সাকুল্য ও ৩) সমানোদক।

*পিণ্ড*

হিন্দু মৃত ব্যক্তির আত্মার স্বর্গলাভের উদ্দেশ্যে তার সপিণ্ডরা আতপ চাল, পাকা কলা, গরুর কাঁচা দুধ, গঙ্গাজল, ঘি, মধু, তিল, গুড়, কর্পুর ইত্যাদি একটি পিতলের পাত্রে বা মালসায় মেখে যে

মিশ্রণ তৈরি করে সেটাই পিণ্ড। এবং সেটি গঙ্গাজলে অথবা অন্যকোন জলাশয়ে নিক্ষেপ করা হয়। সপিণ্ড মোট ৫৩ জন, এরা প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারী।

*সপিণ্ডের তালিকা নিম্নরূপ*

১. পুত্রের পক্ষ হতে অধঃস্তন তিন পুরুষ যথা-পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং কন্যার তরফ হতে অধঃস্তন তিন পুরুষ যথা- কন্যার পুত্র, পুত্রের কন্যার পুত্র, পুত্রের পুত্রের কন্যার পুত্র -৬ জন।
২. পিতার তরফ হতে উর্ধতন তিন পুরুষ এবং মাতার তরফের তিন পুরুষ হতে -৬ জন।
৩. ভ্রাতা, ভ্রাতার পুত্র, ভ্রাতার পুত্রের পুত্র, এভাবে খুড়ার তিন পুরুষ, পিতার খুড়ার তিন পুরুষ, ভগ্নির পুত্রের তিন পুরুষ, ভ্রাতার কন্যার পুত্র ও তিন পুরুষ, পিতার কুড়ার কন্যার খুড়া ও তিন পুরুষ, মামা ও তার তিন পুরুষ, মাতার খুড়া ও তার তিন পুরুষ, মামার কন্যার পুত্র, মামার পুত্রের পুত্র এভাবে - ৩৬ জন।
৪. মহিলা যথা, বিধবা স্ত্রী, কন্যা, মাতা, পিতার মাতা এবং পিতার মাতার মাতা - ৫০ জন।

মোট ৫৩ জন

সপিণ্ডের উপরোক্ত কেউ জীবিত থাকলে সাকুল্য ও সমানোদক শ্রেণীর কেউ উত্তরাধিকারী হবে না। সুতরাং তাদের আলোচনা এখানে অনেকটা বেহুদা।[৫]

*মিতক্ষরা ও দায়ভাগ আইনে হিন্দু নারীর ওয়ারিসী স্বত্ব*

* দায়ভাগ আইনে সপিণ্ডের মধ্যে মহিলার সংখ্যা মাত্র পাঁচজন। এরা আবার দুই প্রকার। পিতৃকুলের সপিণ্ড এবং মাতৃকুলের সপিণ্ড। পিতৃকুলের সপিণ্ড বর্তমান থাকলে মাতৃকুলের সপিণ্ডরা ওয়ারিশ পায় না। দায়ভাগ আইন উত্তরজীবী সূত্র স্বীকার করে না। মৃত ব্যক্তির সপিণ্ডদের প্রথম ৪ স্তরের অর্থাৎ পুত্র বা পুত্রের বিধবা স্ত্রী, পৌত্র বা পৌত্রের বিধবা স্ত্রী, প্রপৌত্র বা প্রৌত্রের বিধবা স্ত্রী এবং মৃতের বিধবা স্ত্রী জীবিত থাকলে কন্যা সন্তান উত্তরাধিকারী হবে না। পেলেও, তাতে জীবনস্বত্বের শর্ত প্রযোজ্য।

  'জীবনস্বত্ব বলতে বুঝায়, যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন সম্পত্তি শুধুমাত্র ভোগ করে যাবে। সম্পত্তি দান, বিক্রি বা উইল করতে পারবে না। অর্থাৎ মালিকানার পরিবর্তন করা যাবে না। কারণ ঐ সম্পত্তির ওপর তার পূর্ণ অধিকার থাকে না। এ সম্পত্তিতে সীমিত অধিকার জন্মায়। উল্লেখ্য জীবনস্বত্ব নারীদের বেলায় প্রযোজ্য।'[৬]

* মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং বিধবা জীবিত থাকলে কন্যা মৃত পিতার সম্পত্তি হতে অংশ পায় না। এ আইনের আওতায় নারীর না পাবার সম্ভাবনাই বেশি থাকে, কারণ উল্লে-খিত ব্যক্তিদের কেউ না কেউ বেঁচে থাকে।

* জীবনস্বত্ব কেড়ে নেয়া হয় যদি অবিবাহিত কন্যা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তদ্রুপ বিধবা যদি অন্যত্র বিবাহ করে তারও ভোগস্বত্ব বাতিল হয়। জীবনস্বত্বে প্রাপ্ত সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের কাছে চলে যাবে।

* তবে বাস্তবতা এই যে, কন্যা সহ অন্য চারজন মহিলাকে স্বপিণ্ডদের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও, এমন অবস্থানে রাখা হয়েছে (চারের পর ৫ থেকে ৫৩ তালিকার মধ্যে রাখা হয়েছে) যে, তাদের অংশ পাবার তেমন সম্ভাবনা নেই। পেলেও তাতে আবার জীবনস্বত্বের শর্ত প্রযোজ্য।
* দায়ভাগ আইনে মৃত ব্যক্তির অন্যান্য ওয়ারিশগণ জীবিত থাকলে কন্যাগণ কোন অংশ পাবে না। অন্যান্য ওয়ারিশগণের অবর্তমানে কন্যাগণ উত্তরাধিকারী হলেও, যে সকল কন্যা বন্ধ্যা কিংবা শুধুমাত্র কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছে তারা মৃত পিতার সম্পত্তির অংশ পাবে না।
* সপিণ্ডরা প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারী। ৫৩ জন সপিণ্ডের মধ্যে ৫ জন মহিলাকে শর্ত ভিত্তিক সপিণ্ডের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কারণ এ ৫ জন মহিলার পুত্র আছে অথবা পুত্র হওয়ার সম্ভবনা আছে। সেই পুত্র মৃত ব্যক্তির আত্মার স্বর্গলাভের উদ্দেশ্যে পিণ্ড দিতে পারে। তাই এ ৫ জন মহিলাকে সপিণ্ড বলা হয়।
* মিতক্ষরা আইনে মৃত ব্যক্তির সকল বিধবা স্ত্রীগণের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত কন্যা সন্তান তার পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হতে পারবে না।
* মিতক্ষরা আইনে যৌথ পরিবারে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। ফলে পিতার জীবিতাবস্থায়ই পুত্র তার অংশ দাবী করতে পারে। কিন্তু কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলেই উত্তরাধিকারী হতে পারে না।
* মিতক্ষরা আইনে ৫৭ জন সপিণ্ডের মধ্যে মাত্র ৫ জন হল মহিলা, আর বাকী ৫২ জনই হল পুরুষ। দায়ভাগ আইনেও ৫৩ জন সপিণ্ডের মধ্যে ৫ জন হল মহিলা। আর এ ৫ জন নারীকে সপিণ্ডের এমন অবস্থানে রাখা হয়েছে যে, তাদের মীরাস পাওয়া দুর্লভ ব্যাপার। স্ত্রী সপিণ্ডের চার নম্বর তালিকায়, মেয়ে পাঁচ নম্বর তালিকায়, মা আট নম্বর তালিকায়, পিতামহী অর্থাৎ পিতার মা চৌদ্দ নম্বর তালিকায় এবং প্রপিতামহী অর্থাৎ পিতার পিতার মা বিশ নম্বর তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
* উল্লেখিত ৫ জন সপিণ্ড মহিলা শুধুমাত্র জীবনস্বত্বে সম্পত্তি পায়। অর্থাৎ যতদিন সে বেঁচে থাকবে শুধুমাত্র তা ভোগ ব্যবহার করতে পারবে। তা বিক্রি, দান বা হেবা কোন কিছুই করতে পারবে না। কুমারী কন্যার যদি বিবাহ হয় তবে জীবনস্বত্বে প্রাপ্ত সম্পত্তির অধিকার হারাবে, অনুরূপভাবে বিধবা স্ত্রী যদি পুনবিবাহ করে, তবে জীবনস্বত্বে প্রাপ্ত সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে না।
* কোন মহিলা যদি তার মৃত কোন মহিলা বা পুরুষ আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে উত্তরাধিকারী হিসাবে সম্পত্তি পায়, তবে তার মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তি যার নিকট থেকে পেয়েছিল তার কাছে ফেরত যাবে।
* পূর্বে হিন্দু আইনে মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র জীবিত থাকলে বিধবা কোন অংশ পেত না। ১৯৩৭ সালে সম্পত্তির উপর বিধবা স্ত্রীর অধিকার সংক্রান্ত (১৯৩৭ সালের ১৮ নং আইন) পাশ হবার পর মৃতের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রের সাথে অংশ পায়। উক্ত আইনটি ১৪-০৪-১৯৩৭ হতে বলবৎ হয়েছে। কিন্তু কৃষি জমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য নয়।[৭]

* শারীরিক ও মানসিকভাবে অযোগ্য ব্যক্তি, যেমন অন্ধ, খঞ্জ, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, কুষ্ঠ বা অন্য কোন দূরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি, পাগল ইত্যাদি হিন্দু মীরাসী আইনে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি পাবে না।[৮]

### *বৌদ্ধ আইন*

বৌদ্ধদের আলাদা কোন উত্তরাধিকার আইন না থাকলেও হিন্দুদের দায়ভাগ আইন তাদের মধ্যে প্রচলিত। বাংলাদেশের মারুয়া বৌদ্ধগণ ব্যতীত অন্যান্য বৌদ্ধগণ সম্পূর্ণভাবে হিন্দু দায়ভাগ আইন দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। Principle of Hindu Law এ বলা হয়েছে, 'Hindu Law applies (iv) to Jaina, Buddhists in India Sikhs except so far as such law is veried by custom.'

মিয়ানমারের বৌদ্ধগণ Burman Buddhist নামে পরিচিত। তারা স্থানীয় উত্তরাধিকার আইনে শাসিত। তাদের উত্তরাধিকারীগণের ক্রম নিম্নরূপ ঃ

মূলধনী (মৃত ব্যক্তি) > ১ম পুত্র > ২য় পৌত্র > ৩য় প্রপৌত্র > ৪র্থ দত্তক পুত্র > ৫ম সৎ মাতার পুত্র > ৬ষ্ট অবৈধ সন্তান ও অবৈধ সৎপত্নীর সন্তান > ৭ম ভ্রাতা ও ভগ্নী > ৮ম পিতামাতা > ৯ম পিতার পিতামাতা > ১০ম দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় > ১০(ক) ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রী > ১০(খ) খুড়া ও খুড়ি> ১০(গ) ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রীর সন্তানগণ > ১০(ঘ) কাজিন > ১০ (ঙ) ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রীর পৌত্র ও পৌত্রীগণ > ১০(চ) কাজিনের সন্তানগণ > ১০(ছ) কাজিনের পৌত্র সন্তানগণ > ১০(জ) কাজিনের প্রপৌত্র সন্তানগণ।[৯]

মিয়ানমারের বৌদ্ধ উত্তরাধিকার আইনে উত্তরাধিকারীগণের যে তালিকা আমরা দেখতে পেলাম তাতে কেবলমাত্র পুরুষদেরই অধিকার রয়েছে। পুত্র থেকে শুরু করে কাজিনের প্রপৌত্র পর্যন্ত প্রায় সবাই পুরুষ। দীর্ঘ তালিকায় প্রপৌত্র, সৎ মাতার পুত্র এমনকি কাজিনের প্রপৌত্র স্থান পেল অথচ মৃতের স্ত্রী, কন্যা ও পৌত্রীর নাম উল্লেখ নেই। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ঐ সব আইনে নারীদেরকে চরমভাবে অবহেলা করা হয়েছে।

### *খৃস্টান আইন*

খৃষ্টানদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রিত হয় সাকসেশন অ্যাক্ট ১৯২৫-এর মাধ্যমে। সাকসেশন অ্যাক্টের ২৭ নং ধারায় বলা হয়েছে :

ক. কোনো মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ে একই মর্যাদার অধিকারী হয় এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে সমান অংশ লাভ করে। অর্থাৎ ছেলে মেয়ে সমান অংশে সম্পত্তি পায়।

খ. কোনো মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি ভাগ-বন্টনের সময় আপন বৈমাত্রেয় ভাই বা বোন সমান মর্যাদার উত্তরাধিকারী হবে। অর্থাৎ সৎ ও আপন ভাইবোন সমান অংশে সম্পত্তি লাভ করবে।

গ. কোন মৃত ব্যক্তি যদি তার সম্পত্তি উইল করে যায় তবে তা বিলি বণ্টন করা যাবে না। তবে উইল যদি আইনগত ত্রুটির কারণে অকার্যকর হয় তবে সেই সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারীদের

অধিকার জন্মাবে। পরিমাণ নিয়ে উইল করার ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি তার সমস্ত সম্পত্তি উইল করতে পারেন।

*খৃস্টান উত্তরাধিকার আইনের বর্ণনা*

বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে বসবাসকারী খৃষ্টানদের জন্য আলাদা কোন উত্তরাধিকারী আইন নেই। বরং ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন (Act 39 of 1925) এর ২৩-২৮ (অংশ-৪) এবং ২৯-৪৯ (অংশ-৫) ধারাসমূহ খৃস্টানদের জন্য প্রযোজ্য।

সাকসেশন অ্যাক্ট ১৯২৫ এর ২৭ নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ

১. স্বামী বা স্ত্রী ঃ স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী এবং স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী পরস্পরের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়। স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের সম্পত্তিতে নিম্নলিখিতভাবে উত্তরাধিকারী হবে ঃ

ক. যদি কোনো রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় যেমন সন্তান, পিতা, মাতা, ভাইবোন না থাকে তবে স্বামী বা স্ত্রী পুরো সম্পত্তিই পাবে।

খ. যদি কোন সন্তান থাকে তবে স্বামী বা স্ত্রী পাবে সম্পত্তির ১/৩ অংশ। সন্তানেরা সমানভাবে পাবে ২/৩ অংশ।

গ. যদি কোনো সন্তান না থাকে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রক্তের সম্পর্কীয় আত্মীয় থাকে তবে স্বামী বা স্ত্রী পাবে ২/৩ অংশ । অন্য আত্মীয়-স্বজনরা ১/৩ অংশ সমানভাবে বন্টন করবে।

২. সন্তান ঃ মৃত পিতা বা মাতার সম্পাত্তিতে সন্তানরা নিম্নলিখিতভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়-

ক. মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে স্ত্রী রেখে গেলে অথবা মৃত ব্যক্তি মহিলা হলে স্বামী রেখে গেলে সন্তানগণ মৃত পিতা বা মাতার সম্পত্তিতে ২/৩ অংশ লাভ করবে।

খ. মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা বা অন্যান্য রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়রা সম্পত্তি থেকে কোনো অংশ পাবে না।

গ. মৃত ব্যক্তির ছেলে ও মেয়ে সবাই সমান হারে সম্পত্তি পাবে।

ঘ. মৃত ব্যক্তির পুত্র ও কন্যার সাথে যদি মৃত সন্তানের পুত্র বা কন্যা থাকে তবে এরা মৃত সন্তানের স্থলাভিষিক্ত হবে।

৩. পিতা ঃ মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকলে তখনই কেবল পিতা সন্তানের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। এ ক্ষেত্রে মৃতের স্ত্রী/স্বামীর অংশ (২/৩) বাদ দিয়ে বাকি অংশ (১/৩) পিতা পাবে।

৪. মাতা ঃ মাতা মৃতের উত্তরাধিকারী হবে ঃ

ক. যখন মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি, পিতা এবং কোন ভাই বা বোন না থাকে তখনই কেবল মাতা সন্তানের উত্তরাধিকারী হবে।

খ. মৃত ব্যক্তির যদি শুধু ভাই বা বোন থাকে তবে মা তাদের সাথে সমানভাবে পাবে।

গ. মৃত ব্যক্তির যদি স্বামী-স্ত্রী,সন্তান পিতা বা কোন ভাইবোন না থাকে তবে মা সম্পূর্ণ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।[১০]

৫. ভাইবোন এবং ভাইবোনের সন্তান ঃ যখন মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি, পিতা-মাতা না থাকে তখনই কেবল ভাইবোন এবং তাদের সন্তানাদি উত্তরাধিকারী হবে। মৃত ব্যক্তির ভাইবোন এবং ভাইবোনের পুত্র-কন্যারা তখনই সম্পত্তি পাবে মৃত ব্যক্তির নিম্নগামী সন্তান (যেমন পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র /কন্যা, পৌত্রী, প্রপৌত্রী) এবং পিতা জীবিত না থাকে।

***খৃস্টান উত্তরাধিকার আইনের পর্যালোচনা***

**খৃস্টান আইনে যে সমস্ত মহিলাদেরকে উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তাদের সংখ্যা মোট ৪ জন।** যথা স্ত্রী, মেয়ে, বোন ও মাতা। এদের মধ্যে বোন ও মাতাকে এমন স্থানে রাখা হয়েছে যে, এদের না পাওয়ার সম্ভবনাই বেশি। যেমন মাতার বেলায় বলা হয়েছে যে, যদি মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি, পিতা এবং কোন ভাই বা বোন থাকে তখন মাতা সন্তানের উত্তরাধিকারী হবে না। এ আইনে বৈপিত্রেয় বোন, বৈমাত্রেয় বোন, দাদী-নানীর জন্য কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

এ আইনে আরো লক্ষণীয় ব্যাপার হলো : স্বামী-স্ত্রী নয় এমন মিলনে যে সন্তান জন্ম লাভ করবে সে অংশ পাবে। এখানে নারী-পুরুষের অবৈধ মিলনকে বৈধ করা হয়েছে।[১১]

## ***৫. ইসলামের মিরাসী আইন***

***ফারায়েযের সংগা***

ফারায়েয ও মীরাস শব্দ দু'টি আরবী। ফারায়েয শব্দটি 'ফরয' এর বহুবচন। এর অর্থ হলো নির্ধারিত বিষয়, অবশ্য করণীয়, নির্দিষ্ট অংশ, পরিমাণ। মীরাস শব্দটি একবচন অর্থ উত্তরাধিকার, **উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি। ইসলামী আইনের পরিভাষায় ফারায়েয, ইসলামী আইন ও হিসাব শাস্ত্রের এমন কিছু নিয়ম-কানুন ও সূত্রাবলী যার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীদের চিহ্নিত করে তাদের মধ্যে বণ্টন করা যায়।**

***উত্তরাধিকারীদের প্রকারভেদ***

নারীর অংশগুলো জানার জন্য উত্তরাধিকারীদের প্রকার নিম্নে বর্ণিত হলো। এ প্রকারগুলোর কোন একটিতেও নারীকে বাদ দেয়া হয়নি।

* ***যাবিল ফুরুয বা আসহাবুল ফারায়েয*** (নির্ধারিত অংশের অধিকারীগণ) যাদের অংশ কুরআন ও হাদীসে নির্ধারিত রয়েছে। এরা মোট ১২ জন। ৪ জন পুরুষ যথা: (১) পিতা, (২) দাদা অর্থাৎ পিতার পিতা (৩) বৈপিত্রেয় ভাই ও (৪) স্বামী এবং ৮ জন মহিলা যথা: (১) স্ত্রী, (২) কন্যা, (৩) নাতনী, (৪) সহোদরা বোন (৫) বৈপিত্রেয় বোন, (৬)) বৈমাত্রেয় বোন, (৭) মাতা ও (৮) দাদী-নানী ।

* ***আসাবা ঃ*** আসাবা মানে দল, সংঘ, স্বগোত্র ব্যক্তি, জ্ঞাতি, স্নায়ু, স্নায়ুকোষ ইত্যাদি। ফারায়েযের পরিভাষায় যাদের জন্য কুরআন-হাদীসে অংশ নির্ধারিত করে দেয়া হয়নি, কিন্তু তারা আসহাবুল ফারায়েয বা যাবিল ফুরুযের অংশ গ্রহণ করার পর অবশিষ্টাংশ সম্পদের হকদার হয়।

আসাবা দুই প্রকারের। 'আসাবায়ে নাসাবিয়া' (বংশীয় বা রক্ত সম্পর্কীয় আসাবা) ও 'আসাবায়ে সাবাবিয়া' (কারণগত আসাবা) আসাবায়ে সাবাবিয়া আমাদের দেশে নেই। কারণ এটি

দাসদাসীদের সাথে সম্পর্কিত। আসাবা নাসাবিয়া আবার তিন প্রকারের। আসাবা বিনফসিহী, আসাবা বিগায়রিহী ও আসাবা মাগায়রিহী।

* ***আসাবা বি-নফসিহী ঃ*** মৃতের সাথে যার সম্পর্ক কোন নারীর মধ্যস্থতায় হয়নি। এরা চারজনঃ (১) মৃতের অধস্তন যেমন পুত্রের কন্যা (২) মৃতের উর্ধ্বতন যেমন বাপ, দাদা (৩) মৃতের বাপের অধস্তন যেমন ভাই, বোন ও (৪) মৃতের দাদার অধস্তন, যেমন চাচা। এদের মধ্যে যারা মৃতের যত নিকটতম হবে, তাদের অগ্রাধিকার ততটুকু জন্মাবে। যেমন পুত্র থাকতে বাপ অংশ পাবে না, এভাবে বাপ থাকতে ভাই অংশ পাবে না, ভাই থাকতে চাচা অংশ পাবে না। এখানে এ কথাও উল্লেখ্য যে, একই পর্যায়ের দুইজন আসাবা এক সাথে থাকলে, যার আত্মীয়তার বন্ধন অধিক দৃঢ়, সে-ই পাবে। যেমন সহোদর ভাই ও সৎ ভাই-এর মধ্যে সহোদরের বন্ধন বেশি দৃঢ়, তাই সে-ই পাবে।

***আসাবা বিগায়রিহী ঃ*** অর্থাৎ যারা অন্যের কারণে আসাবা হয়। এরা চারজন যথাঃ (১) কন্যা (২) পৌত্রী (৩) সহোদরা ও (৪) সৎ বোন। এরা এক হলে অংশ পাবে অর্ধেক, আর দুয়ের অধিক হলে দুই তৃতীয়াংশ পাবে। কিন্তু অন্যের কারণে তথা ভাই থাকার কারণে এরা আসাবা হয়ে গেল। তবে এখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে, যে নারীর যাবিল ফুরুযে নেই, তার ভাই আসাবা হলেও সে আসাবা হবে না। যেমনঃ ফুফু, চাচা আছে, তথাপি ফুফু আসাবা নয়। কেননা সে যাবিল ফুরুয নয়।

***আসাবা মা-গায়রিহী ঃ*** অর্থাৎ অন্যের সাথে আসাবা হয়। এরা হলো সে সকল নারী যারা অন্য নারীর সাথে আসাবা হয়। যেমন ভগ্নী। কন্যা থাকলে কন্যার সাথে সে আসাবা ।

* ***যাবিল আরহাম ঃ*** যাবিল ফুরুয ও আসাবা এর অবর্তমানে যারা বংশগত সম্পর্কিত আত্মীয় বা দূরবর্তী আত্মীয় তাদেরকে যাবিল আরহাম বলা হয়। তারা হলো: (১) মেয়ের আওলাদ (২) বোনের আওলাদ (৩) ভাইঝি, (৪) চাচাতো বোন (৫) ফুফাতো বোন (৬) মামা, খালা (৭) নানা (৮) বাপের বৈমাত্রেয় ভাই (৯) ফুফু (১০) বৈমাত্রেয় ভাইয়ের আওলাদ।[১২]

### ৬. *আল-কুরআনে বর্ণিত অংশসমূহ*

মহান আল্লাহ আল কুরআনে ছয়টি অংশ নির্ধারণ করেছেন। যেমন: অর্ধ, এক চতুর্থাংশ, এক অষ্টমাংশ, দুই তৃতীয়াংশ, এক তৃতীয়াংশ ও এক ষষ্ঠাংশ। এ কয়টি হারেই সম্পদ উলেখিত উত্তরাধিকারদের মধ্যে বণ্টিত হয়। বিভিন্ন উত্তরাধিকারদের অংশের তারতম্য ঘটলেও এ ছয়টির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ তাআলা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুত্র দুই কন্যার অংশের সমান পাবে, আর যদি কন্যা দুইয়ের অধিক হয় তবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে। একমাত্র কন্যা হলে অর্ধেক পাবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে পিতা-মাতা (প্রত্যেকে) ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকে এবং পিতামাতাই উত্তরাধিকারী হয়, তা হলে মাতার প্রাপ্য এক তৃতীয়াংশ। আর যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাইবোন থাকে, তাহলে মাতা এক ষষ্ঠাংশ পাবে।' 'তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে; আর যদি তাদের কোন সন্তান থাকে তবে তোমরা পাবে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ। এটা তারা যে অসিয়ত করে

যায়, তা আদায় করার পর এবং ঋণ পরিশোধ করার পর। আর তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তাহলে তারা পাবে তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ। এ সকল তোমাদের কৃত অসিয়ত আদায় করার পর এবং ঋণ পরিশোধ করার পর। যদি কোন পুরুষ অথবা নারী পিতামাতাহীন অবস্থায় কাউকে উত্তরাধিকারী করে এবং তার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন থাকে, তবে প্রত্যেকে পাবে এক ষষ্ঠাংশ। যদি তারা তদপেক্ষা বেশি হয়, তবে তারা সকলে একত্রে এক তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে। এটা কৃত অসিয়ত আদায় করার পর এবং ঋণ পরিশোধ করার পর। এ শর্তে যে, কারো ক্ষতি না করে। আলাহ মহাজ্ঞানী, অতীব সহনশীল।'[১৩] '(হে নবী) লোকেরা আপনাকে (উত্তরাধিকারের) বিধান জিজ্ঞাস করে, আপনি বলে দিন আল্লাহ তোমাদেরকে পিতামাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিচ্ছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার একজন বোন থাকে, তবে সে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক অংশ পাবে। এবং এ ব্যক্তি বোনের উত্তরাধিকার হবে, যদি তার কোন সন্তান না থাকে। আর যদি বোন দুইজন হয়, তবে তারা ভাইয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি ভাই বোন উভয়ে থাকে, তবে একজন পুরুষের অংশ হবে দুইজন নারীর অংশের সমান। তোমরা বিভ্রান্ত হবে এ জন্য আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে পূর্ণ অবগত।'[১৪]

### ৭. *নারীদের মীরাসের অংশসমূহ*

***স্ত্রীর মীরাস ঃ*** **স্ত্রী তার স্বামীর মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী স্বত্ব** লাভ করবে। এ জন্য দুটি অবস্থা রয়েছে।

এক, মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকলে চার ভাগের এক। যেমন- জনাব 'ক' সাহেব মৃত্যুকালে স্ত্রী ও পিতা রেখে গেছেন।

অর্থাৎ স্ত্রী পাবে ১/৪ এবং পিতা পাবে ৩/৪।

দুই, সন্তান থাকলে আট ভাগের এক। যেমন জনাব 'খ' মৃত্যুকালে এক পুত্র এবং স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন।

অর্থাৎ স্ত্রী পাবে ১/৮ এবং পুত্র পাবে ৭/৮।

কেউ যদি একের অধিক স্ত্রী রেখে যায়, তবে তাদের মিরাস বৃদ্ধি পাবে না। বরং ১/৪ ও ১/৮ তাদের মধ্যে সমহারে বন্টিত হবে।[১৫]

***কন্যার মীরাস ঃ*** কন্যা তার পিতার উত্তরাধিকারী সম্পদ লাভ করে। এ জন্য তার তিনটি অবস্থা রয়েছে।

এক, কন্যা যদি একজন হয় এবং মৃতের কোন পুত্র সন্তান না থাকে তবে সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। যেমন জনাব 'গ' মৃত্যুকালে এক কন্যা ও পিতা রেখে গেছেন।

অর্থাৎ কন্যা পাবে ১/২ এবং পিতা পাবে ১/২।
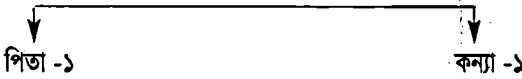
দুই, কন্যা যদি একাধিক হয় এবং পুত্র সন্তান না থাকে, তবে সমস্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই অংশ পাবে। তিন, কন্যার সাথে যদি পুত্র থাকে তবে প্রত্যেক পুত্র প্রত্যেক কন্যার দ্বিগুণ পাবে। যেমন জনাব 'গ' মৃত্যুকালে দুই কন্যা ও পিতা রেখে গেছেন।
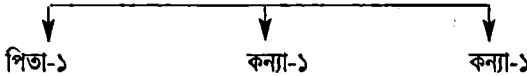
অর্থাৎ প্রত্যেক কন্যা পাবে ১/৩ এবং পিতা পাবে ১/৩।

তিন, কন্যার সাথে যদি মৃতের ছেলে থাকে তবে প্রত্যেক ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ পাবে। যেমন জনাব 'গ' মৃত্যুকালে এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে যান। এমতাবস্থায়,
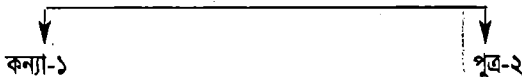
অর্থাৎ প্রত্যেক কন্যা পাবে ১/৩ এবং পুত্র পাবে ২/৩।

কন্যাদের অংশ বণ্টন করার পর মৃত ব্যক্তির যদি কোন ওয়ারিশ না থাকে তবে সমস্ত সম্পত্তি তাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।[১৬]

***মাতার মীরাস ঃ*** মৃত ব্যক্তির মাতা তার সম্পত্তিতে অংশ পাবে। এ জন্য তিনটি অবস্থা বিদ্যমান। এক, মৃত ব্যক্তির যদি সন্তান থাকে বা পুত্রের সন্তান বা অধস্তন কেউ থাকে অথবা যে কোন

প্রকারের দুই বা ততোধিক ভাই বা বোন থাকে তাহলে মাতা ছয় ভাগের এক পাবে। যেমন জনাব 'ঘ' মৃত্যুকালে মা, পুত্র ও কন্যা রেখে যান। এমতাবস্থায়,

অর্থাৎ মা পাবেন ১/৬ কন্যা পাবে ১/৬ এবং প্রত্যেক পুত্র পাবে ২/৬।
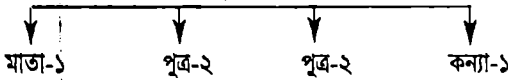
দুই. মৃত ব্যক্তির যদি সন্তান না থাকে বা পৌত্র-পৌত্রি বা অধস্তন কেউ না থাকে অথবা যে কোন প্রকারের দুই বা ততোধিক ভাই বা বোন না থাকে তাহলে মাতা তিন ভাগের এক পাবে। যেমন জনাব 'ঘ' মৃত্যুকালে মা ও পিতা রেখে যান। এমতাবস্থায়,

অর্থাৎ মা পাবেন ১/৩ পিতা পাবেন ২/৩।

তিন, মৃত ব্যক্তির যদি সন্তান না থাকে বা পুত্রের সন্তান বা অধস্তন কেউ না থাকে অথবা যে কোন প্রকারের দুই বা ততোধিক ভাই বা বোন না থাকে তাহলে মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর এবং মৃত ব্যক্তি নারী হলে স্বামীর অংশ দেয়ার পর মাতা তিনভাগের এক পাবে। যেমন জনাব 'ঘ' মৃত্যুকালে মা, স্ত্রী ও দাদা রেখে যান। এমতাবস্থায়,

অর্থাৎ দাদা পাবেন ৫/১২ মাতা পাবেন ৪/১২ এবং স্ত্রী পাবেন ৩/১২।
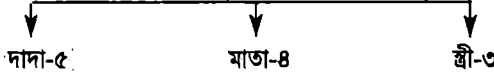
***সহোদর বোনের মীরাস ঃ*** মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে সহোদর বোন মীরাস পাবে।

এক, সহোদর একজন হলে অর্ধেক সম্পত্তির মালিক হবে। যেমন জনাব 'ঙ' মৃত্যুকালে এক বোন ও চাচা রেখে যান। এমতাবস্থায়,

অর্থাৎ সহোদর বোন পাবে ১/২ চাচা পাবে ১/২ ।
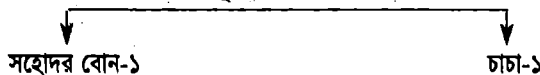
দুই, দুই বা ততোধিক হলে সবাই মিলে দুই তৃতীয়াংশের মালিক হবে। যেমন জনাব 'ঙ' মৃত্যুকালে চাচা, দুই সহোদর বোন রেখে যান। এমতাবস্থায়,

অর্থাৎ চাচা পাবেন ১/৩ এবং প্রত্যেক বোন পাবে ১/৩ ।

তিন, মৃত ব্যক্তির কন্যা বা পৌত্রীগণ থাকলে বোন আসাবা হবে। অর্থাৎ উল্লেখিত দুইজন অংশ নেয়ার পর অবশিষ্ট থাকলে তারা অংশ পাবে। যেমন জনাব 'ঙ' মৃত্যুকালে এক কন্যা, এক পৌত্রি ও দুই বোন রেখে যান। এমতাবস্থায়,

অর্থাৎ কন্যা পাবেন ৩/৬ পৌত্রি ১/৬ এবং প্রত্যেক বোন পাবে ১/৬ ।
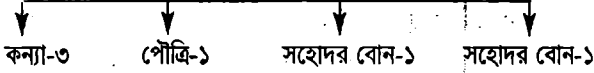
***পৌত্রীদের মীরাস ঃ*** মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পৌত্রীদের (পুত্রের কন্যাদের) অংশ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি অবস্থার উদ্ভব হতে পারে।

এক, যদি মৃত ব্যক্তির কোন কন্যা সন্তান না থাকে তবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। যেমন জনাব 'চ' মৃত্যুকালে স্ত্রী, ভাই ও পৌত্রি রেখে যান। এমতাবস্থায়,

অর্থাৎ স্ত্রী পাবেন ১/৮ এবং পৌত্রি পাবে ৪/৮ ভাই পাবে ৩/৮ ।
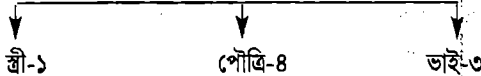
দুই, পৌত্রী যদি একাধিক হয় এবং কোন কন্যা সন্তান না থাকে তবে তারা পাবে দুই তৃতীয়াংশ। যেমন জনাব 'চ' মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই পৌত্রি ও চাচা রেখে যান। এমতাবস্থায়,

অর্থাৎ চাচা পাবেন ৫/২৪ এবং প্রত্যেক পৌত্রি পাবে ৮/২৪ এবং স্ত্রী পাবে ৩/২৪।
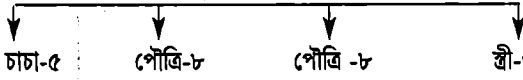
তিন, মৃত ব্যক্তির কন্যা সন্তান থাকলে তবে পৌত্রীগণ পাবে ছয় ভাগের এক। যেমন জনাব 'চ' মৃত্যুকালে এক কন্যা, এক পৌত্রি ও চাচা রেখে যান। এমতাবস্থায়,

অর্থাৎ চাচা পাবেন ২/৬ এবং পৌত্রি পাবে ১/৬ এবং কন্যা পাবে ৩/৬।
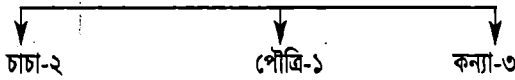
***বৈমাত্রেয় বোনের মীরাস ঃ*** মা দুইজন কিন্তু পিতা একজন হলে অর্থাৎ পিতার অন্য স্ত্রীর গর্ভের কন্যা সন্তানকে বৈমাত্রেয় বোন বলা হয়। মৃত ব্যক্তির এমন বোন মীরাস পায়। তবে তাদের কয়েকটি অবস্থা অতিক্রম করতে হবে।

এক, এমন একজন বোন হলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। যেমন জনাব 'ছ' মৃত্যুকালে চাচা ও এক বৈমাত্রেয় বোন রেখে যান। এমতাবস্থায়,
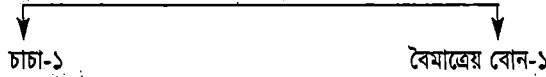
অর্থাৎ চাচা পাবেন ১/২ এবং বৈমাত্রেয় বোন পাবে ১/২।

দুই, দুই বা ততোধিক হলে সবাই মিলে দুই তৃতীয়াংশ পাবে তবে শর্ত হলো, মৃতের কোন সহোদর বোন থাকতে পারবে না। যেমন জনাব 'ছ' মৃত্যুকালে চাচা ও দুই বৈমাত্রেয় বোন রেখে যান। **এমতাবস্থায়,**
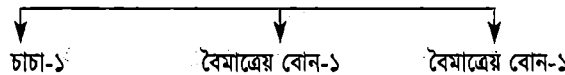
অর্থাৎ চাচা পাবেন $^{১}/_{৩}$ এবং প্রত্যেক বৈমাত্রেয় বোন পাবে $^{১}/_{৩}$ ।

তিন, মৃত ব্যক্তির একজন সহোদর বোন থাকলে সে ক্ষেত্রে এক বা একাধিক বৈমাত্রেয় বোন সকলেই পাবে এক ষষ্টমাংশ। যেমন জনাব 'ছ' মৃত্যুকালে একজন সহোদর বোন, একজন বৈমাত্রেয় বোন ও চাচা রেখে যান। এমতাবস্থায়,
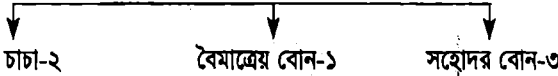
অর্থাৎ চাচা পাবেন $^{২}/_{৬}$ এবং বৈমাত্রেয় বোন পাবে $^{১}/_{৬}$ এবং সহোদর বোন পাবে $^{৩}/_{৬}$ ।

চার, সহোদর বোন দুই বা ততোধিকের বর্তমানে বৈমাত্রেয় বোনের সাথে যদি বৈমাত্রেয় ভাই থাকে অথবা মৃত ব্যক্তির কন্যা বা পৌত্রি বর্তমান থাকলে বৈমাত্রেয় বোনগণ আসাবা হবে। সহোদর বোনগণ তাদের তিনভাগের দুই ভাগ নেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা বৈমাত্রেয় ভাইবোনগণ পাবে। যেমন জনাব 'ছ' মৃত্যুকালে দুইজন সহোদর বোন, একজন বৈমাত্রেয় বোন, বৈমাত্রেয় ভাই ও চাচা রেখে যান। এমতাবস্থায়,

অর্থাৎ প্রত্যেক সহোদর বোন পাবেন $^{৩}/_{৯}$ এবং বৈমাত্রেয় বোন পাবে $^{১}/_{৯}$ এবং বৈমাত্রেয় ভাই পাবে $^{২}/_{৯}$ ।

***বৈপিত্রেয় বোনের মীরাস ঃ*** পিতা দুইজন কিন্তু মাতা একজন। এ ধরনের বোনও মৃত ব্যক্তির মীরাস পাবে। তার জন্য কয়েকটি অবস্থা রয়েছে।

এক, যদি বোন একজন হয় তবে এক ষষ্ঠমাংশ পাবে। যেমন জনাব 'জ' মৃত্যুকালে চাচা, মা ও একজন বৈপিত্রেয় বোন রেখে যান। এমতাবস্থায়,

অর্থাৎ চাচা পাবেন $^{৩}/_{৬}$, মা পাবেন $^{২}/_{৬}$ এবং বৈপিত্রেয় বোন পাবে $^{১}/_{৬}$ ।
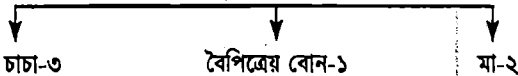
দুই, বৈপিত্রেয় বোন দুই বা ততোধিক হলে কিংবা বৈপিত্রেয় বোনের সাথে বৈপিত্রেয় ভাই থাকলে সবাই মিলে এক তৃতীয়াংশ পাবে। যেমন জনাব 'জ' মৃত্যুকালে মা, দুই বৈপিত্রেয় বোন, একজন বৈপিত্রেয় ভাই এবং চাচা রেখে যান। এমতাবস্থায়,

অর্থাৎ চাচা পাবেন ৯/১৮, বৈপিত্রেয় ভাই ২/১৮, প্রত্যেক বৈপিত্রেয় বোন পাবে ২/১৮ এবং মা পাবেন ৩/১৮ ।

***দাদীর মীরাস ঃ*** কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে দাদী তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ওয়ারিশ পাবে। এক, মৃত ব্যক্তির পিতা কিংবা মাতা না থাকলে দাদী এক ষষ্টাংশ পাবেন। যেমন জনাব 'ঝ' মৃত্যুকালে কন্যা, ভাই ও দাদী রেখে যান। এমতাবস্থায়,

অর্থাৎ কন্যা পাবে ৩/৬ , ভাই পাবে ২/৬ এবং দাদী পাবেন ১/৬ ।[১৭]

### ***৮. মীরাসে নারীর অংশসমূহের পর্যালোচনা***

ইসলাম মৃত ব্যক্তির কন্যা, বোন, স্ত্রী ও মাতাকে উত্তরাধিকারী করেছে। কোন অবস্থাতেই তাদেরকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করেনি। নারীর মীরাস সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।

* জাহেলি যুগে মীরাসের মানদণ্ড ছিল দুটি। একটি ছিল বংশ। আর দ্বিতীয়টি ছিল কারণ। বংশের দিক দিয়ে যে মীরাস দেয়া-নেয়া হতো, তাতে বালক শিশু ও নারীদেরকে মীরাস দেয়া হতো না। মীরাস দেয়া হতো বীর পুরুষ যুদ্ধবাজ সন্তানদেরকে যারা গনীমতের সম্পদ অর্জন করে এনেছে। এ কথা ইবনে আবাস রা. ও সাঈদ ইবনে যোবাইর রা. থেকে বর্ণিত। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন ঃ হে নবী! 'লোকেরা তোমার নিকট নারীদের ব্যাপারে ফতোয়া চায়। বলে দাও আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন এবং একই সাথে সেই বিধানও স্মরণ করিয়ে দেন, যা প্রথম থেকে এই কিতাবে তোমাদের শুনানো হচ্ছে। অর্থাৎ এতিম মেয়েদের সম্পর্কিত বিধানসমূহ, যাদের হক তোমরা আদায় করছো না। এবং যাদেরকে বিয়ে দিতে তোমরা বিরত থাকছো (অথবা লোভের বশবর্তি হয়ে নিজেরাই যাদেরকে বিয়ে করতে চাও)।[১৮] অর্থাৎ এ

সূরার শুরুতে এতিম বিশেষ করে এতিম নারীদের সম্পর্কে যেসব বিধি-বিধান বর্ণনা করেছিলেন সেগুলো যথাযথ মেনে চলার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

* অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলামে নারীদেরকে জীবনস্বত্বে মিরাস দেয়া হয়নি। জীবনস্বত্ব বলতে বুঝায় জীবন যতদিন আছে ততদিন তা শুধু ভোগ করতে পারবে। ঐ পরিবারের অন্য কোন পুরুষের সহায়তা ব্যতীত তা বিক্রি করতে পারবে না। কিন্তু ইসলামের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি সম্পূর্নভাবে তাদেরই স্বত্ব হিসাবে গণ্য হবে। তারা এটি যেভাবে চান সেভাবে ভোগ ব্যবহার করতে পারবেন। অন্যদের এতে নাগ গলাবার অধিকার থাকবে না। তারা তা নিজের কাছে রেখেও দিতে পারেন অথবা প্রয়োজন হলে তা বিক্রি, বন্ধক, হেবা, দান বা অন্যান্য হস্তান্তরও করতে পারেন। এতে পরিবারের কারো সহায়তার প্রয়োজন নেই।

* কোন কোন ধর্মে মহিলাদেরকে এমন স্থান বা পর্যায়ে রাখা হয়েছে যে, তাদের মিরাস লাভে অনেকটা অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। কিন্তু ইসলামের মিরাস বণ্টন পদ্ধতি এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যে মহিলারা কোন ক্রমেই বঞ্চিত হয় না। স্ত্রী, কন্যা ও মাতা যে কোন পরিস্থিতিতে বা যে কোন পর্যায়ে হোক না কেন, এরা অবশ্যই মীরাস পাবে। যেমন জনৈক পুরুষ লোক মৃত্যুর সময় ছেলে, মেয়ে, পৌত্র, পৌত্রি, স্ত্রী, পিতা, মাতা, দাদা, দাদী, চাচা, তিন প্রকারের ভাই ও বোন (সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয়) রেখে গেলেও স্ত্রী, কন্যা ও মাতা মীরাস পাবেই।

* ইসলামের মীরাসী আইনে নিম্নলিখিত ছয়জন আত্মীয় কোন অবস্থাতেই মীরাস থেকে বঞ্চিত হয় না ঃ (১) পিতা (২) মাতা (৩) পুত্র (৪) কন্যা (৫) স্বামী ও (৬) স্ত্রী । লক্ষণীয় এ ছয়জনের অর্ধেকই নারী।

* আল কুরআনে নারীর অংশ নির্ধারিত করে তাদেরকে সম্মানিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে যাবিল ফুরুযের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যাবিল ফরুয মোট ১২ জন। এ ১২ জনের মধ্যে ৪ জন মাত্র পুরুষ এবং বাকি ৮ জনই মহিলা। অর্থাৎ নারীরা পুরুষের দ্বিগুণ। এত অধিক সংখ্যক মহিলার মিরাস লাভ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদে পরিলক্ষিত হয় না।

* আসাবা ও যাবিল আরহাম এর সংগা আগেই প্রদান করা হয়েছে। এ দুটিতেও মেয়েদের অংশ রাখা হয়েছে।

* আল্লাহর কথা ঃ 'এক পুত্র দুই কন্যার সমপরিমাণ অংশ পাবে' অর্থাৎ পুত্র কন্যার দ্বিগুণ পাবে। মনে রাখা প্রয়োজন এখানে পুত্রের অংশকে কন্যার অংশের ওপর ভিত্তি করা হয়েছে। পুত্রের অংশ কমবেশি পাওয়া বা না পাওয়ার ব্যাপারে কন্যার অংশকেই মূলভিত্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে। এভাবে বোন, বৈপিত্রেয় বোনের অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে নারী তথা মাতার দিক দিয়ে সম্পর্ককেই প্রাধান্য দিয়েছে।

* ইসলামের মিরাসী আইন অনুসারে সকল অবস্থায় সমান অধিকার। অর্থাৎ কন্যা অবিবাহিতা হোক বা বিবাহিতা, পুত্র সন্তানের মা হোক বা কন্যা সন্তানের অথবা বন্ধা হোক সকল অবস্থায় পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ পাবে। অন্ধ, বোবা, বধির, দূরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্থ হলেও সে মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে না। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বেঁচে থাকলেও কন্যা অংশ পাবে।

কেউ যদি অন্যায়ভাবে জীবিতাবস্থায় সম্পদ বণ্টন করে দেন এবং মৃত্যুর পর যদি পরিলক্ষিত হয় যে এ কারণে অন্যান্য উত্তরাধিকারগণ বঞ্চিত হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে অসিয়তের পন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ অসীয়তের সর্বোচ্চ সীমা হলো এক তৃতীয়াংশ। কিন্তু কেউ যদি উদ্দেশ্যমূলকভাবে এর অধিক অসিয়ত করেন, তবে মৃত্যু পরবর্তি সময়ে উত্তরাধিকারীগণ ইচ্ছা করলে এক তৃতীয়াংশই কার্যকর করতে পারবেন অথবা কৃত অসিয়ত ঠিক রাখতেও পারেন। তদ্রূপ কোন ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় কাউকে বঞ্চিত করে ধন-সম্পদ বণ্টন করে দিলে, মৃত্যুর পর তা বাতিল করে আল্লাহর দেয়া পন্থায় সম্পদ পুনঃবণ্টন করতে পারে।

(খ) ওসিয়ত তো আমাদের সমাজে বিলুপ্ত প্রায়। সামান্য যা আছে তাতেও বাড়াবাড়ির প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তিনভাগের এক ভাগ ওসিয়তের হুকুম থাকা সত্ত্বেও অন্যের হক নষ্ট করার নিমিত্তে নির্ধারিত অংশের বেশি ওসীয়ত করে। অথবা যে ব্যক্তির সন্তানাদি নেই আবার মা-বাপও নেই যাকে কালালাহ বলা হয়, সে দূরবর্তী আত্মীয়ের হক নষ্ট করার নিমিত্তে সম্পত্তি নষ্ট করার চেষ্টা করে। সম্পদ অন্যেরা নিয়ে যাবে এ ভয়ে ভাই অথবা বোনের ছেলেকে এনে লালন-পালন করে পুরো সম্পদ তার নামে লিখে দেয়। এ ধরনের ক্ষতিকারক বিষয়কে কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে, অসিয়তের ক্ষেত্রে অন্যকে ক্ষতি করার প্রবণতা বড় গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। অন্য এক হাদীসে নবী স. বলেছেন, মানুষ তার সারা জীবন জান্নাতবাসীদের মতো কাজ করতে থাকে এবং মরার সময় অসিয়তের ক্ষেত্রে অন্যের ক্ষতি করার ব্যবস্থা করে নিজের জীবনের আমলনামাকে এমন কাজের মাধ্যমে শেষ করে যায়, যা তাকে জাহান্নামের অধিকারী করে দেয়। নবী স. আরো বলেছেন, 'কোন পুরুষ ও স্ত্রী ষাট বছর ব্যাপী আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করে অতঃপর মৃত্যুর সম্মুখীন হয় এবং অসীয়তের মাধ্যমে অন্যের ক্ষতি সাধন করে। এর ফলে জাহান্নাম তার জন্য অনিবার্য হয়ে যায়।'[১৯] অসীয়তের প্রভিশন রাখা হয়েছে ওয়ারিশ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিদের জন্য। যারা মীরাস পাবে তাদের জন্য যদি অসিয়ত করা হয় তবে এটি একদিকে যেমন আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধ কাজ অপরদিকে চরম অমানবিকও বটে।

(গ) অনেকে মনে করেন যে, কন্যারা স্বামীর বাড়িতে ধন-সম্পদ নিয়ে যাবে, এ ভয়ে জীবিতাবস্থায় সমস্ত সম্পদ ছেলেদের নামে দলিলপত্র করে দেন অথবা মেয়েদের সামান্য কিছু দিয়ে কোনক্রমে বিদায় করে দেয়া হয়। এটিও একটি মারাত্মক অন্যায় ও ইসলামী আইনের সুস্পষ্ট লংঘন। তাছাড়া এটি জাহেলি যুগের একটি প্রথা। জাহেলি যুগে ছোট বাচ্চা এবং মেয়েদেরকে মীরাস দেয়া হতো না। মীরাস দিত সেই সকল সবল পুরুষ সন্তানকে যারা অশ্বের পিঠে সওয়ার হয়ে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করেছে এবং গণীমতের মাল অর্জন করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছেঃ পুরুষদের অংশ দু'জন মেয়ের সমান। যদি দুয়ের বেশি মেয়ে হয়, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিনভাগের দুভগ তাদের দাও। আর যদি একটি মেয়ে ওয়ারিশ হয়, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তার।'[২০] সুতরাং তাদেরকে অংশ থেকে বঞ্চিত করা আল্লাহর উল্লেখিত হুকুম বা আইনের সম্পূর্ণ লংঘন বলে বিবেচিত হবে। এ ক্ষেত্রেও ব্যক্তির মৃত্যুর পর আল কুরআনের মীরাসী আইন অনুযায়ী সম্পদ পুনঃবণ্টন করা যেতে পারে।

(ঘ) আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায় যে, পিতামাতার মৃত্যুর পর ছেলে উত্তরাধিকারীরা বিভিন্ন কলা-কৌশল অবলম্বন করে মৃত ব্যক্তির মেয়ে উত্তরাধিকারীদেরকে বঞ্চিত করে থাকে। কোন কোন এলাকায় মেয়েরা ওয়ারিশ গ্রহণ করবে, এটিকে ঘৃণার বিষয় মনে করা হয়। এমন কুপ্রথাও প্রচলিত আছে যে, 'বাপের বাড়ীর মিরাস গ্রহণ করলে সংসারে অশান্তি নেমে আসে এবং সংসারের উন্নতি হয় না।' ফলে মেয়েটির স্বামী তাকে হক আনতে নিষেধ করে। সমাজের সুবিধাবাদী লোকেরাই মূলত নিজেদের বদ-মতলব চরিতার্থ করার জন্য এ ধরনের জঘন্য ও কুপ্রথা গড়ে তুলেছে। তারা এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে যার দরুন মেয়েটি তার অংশ নিতে আর এগিয়ে আসে না। এ সমস্ত লোক দুষ্ট, লোভী ও স্বার্থপর। বোনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাতের দরুন অবশ্যই এদেরকে আল্লাহর বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে বোন মনে করে যে, অংশ চাইতে গেলে ভাই রাগ করবে অথবা ভাইয়ের সাথে মন কষাকষি হবে। ফলে সে তার অংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় অথবা চক্ষু লজ্জায় মাফ করে দেয়। এ দিকে ধূর্ত ভাইটি নিরব ভূমিকা পালন করতে থাকে। এক সময় দেখে যে বোনটি আর তার অংশ দাবী করছে না। মনে রাখা প্রয়োজন এ ধরনের মাফ ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। এ ক্ষেত্রে ভাইয়ের কর্তব্য হবে যেহেতু আদরের বোনটি নিজের অংশ চাইতে লজ্জা পাচ্ছে, তাই স্বেচ্ছায় বোনের অংশ ভাগ করে তাকে বুঝিয়ে দেয়া। রসূল স. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কারো উত্তরাধিকার হরণ করব, আল্লাহ তাআলা তাঁর জান্নাতের উত্তরাধিকার হরণ করবেন।'[২১]

(ঙ) কোন ক্রমে বোনেরা তাদের অধিকার নিতে এগিয়ে এলেও, এ ক্ষেত্রেও তারা কয়েকটি বৈষম্যের শিকার হয়। এক, ভাইয়েরা অধিকতর ভাল ও বেশি মূল্যের সম্পত্তিগুলো নিজেদের অংশে রেখে অতি নিম্নমানের বা কমমূল্যের সম্পত্তিগুলো বোনদেরকে দেয়। দুই, কোন কোন এলাকায় প্রচলিত আছে যে, মেয়েরা বাড়ি বা বাস্তভিটার অংশ পায় না। এটিও সমাজের সুবিধাবাদী লোকেরা বদ-মতলব চরিতার্থ করার জন্য একটি কুপ্রথা গড়ে তুলেছে। ইসলামের মীরাসী আইনে বণ্টন প্রক্রিয়ায় সম্পদের কোন শ্রেণী বিন্যাস করা হয়নি। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মা-বাপ ও আত্মীয়-স্বজনরা যে ধন-সম্পত্তি রেখে গেছে তাতে পুরুষদের অংশ রয়েছে। আর মেয়েদেরও অংশ রয়েছে সেই সম্পত্তিতে, যা মা-বাপ ও আত্মীয়-স্বজনরা রেখে গেছে, তা সামান্য হোক বা বেশি এবং এ অংশ (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নির্ধারিত।'[২২] এ আয়াতের আলোকে বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, যে মৃত ব্যক্তির সমুদয় সম্পত্তি, স্থাবর কি অস্থাবর এমন কি এক টুকরো কাপড়ও তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। তিন, বোনদের ফুসলিয়ে খুব স্বল্প বা নামমাত্র মূল্যে সম্পদ তার ভাইয়েরা ক্রয় করে নেয়। এটিও ইসলামের দৃষ্টিতে ঠিক নয়। তাকে বাজার মূল্য থেকে কম দেয়া হলে আত্মসাতকারীর পর্যায়ে পড়বে।

(চ) নিঃসন্তান ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় সমস্ত সম্পতি স্ত্রীকে লিখে দেয়, এটি অবৈধ। পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তিটির সন্তান না থাকায়, তার ভাইয়েরা তার অসহায় স্ত্রীকে তার প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত করে অথবা নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করে তাকে স্বামীর ভিটেমাটি ছাড়া করে। এটি মানবতার সাথে মারাত্মক অসদাচরণ।

(ছ) কারো শুধুমাত্র একটি অথবা দুটি মেয়ে আছে, সে মনে করে যে, এরা অর্ধেক অথবা দুই তৃতীয়াংশ পাবে, বাকি সম্পত্তি অন্যেরা নিয়ে যাবে এটা কি করে হয়। তাই জীবিতাবস্থায় সমস্ত সম্পত্তি তাদের নামে লিখে দেয়। এটি আল্লাহর আইনের সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ। যারা আল্লাহর আইনটি সম্পর্কে অল্পবিস্তর জ্ঞান রাখেন, তারা জায়েজ করার নিমিত্তে তসবিহ, এক যিলদ কুরআন শরীফ ও একখান জায়নামাযের পরিবর্তে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দেন। এখানে নিয়তের ওপর আমি হামলা করতে চাই না। তবে বুখারী শরীফের প্রথম সেই হাদীসটি যা নিয়তের ব্যাপারে বলা হয়েছে তা স্মরণ করার অনুরোধ করবো। সেই সাথে আর একটু শক্ত কথা বলতে চাই 'আল্লাহ আপনার আমার চেয়ে অধিক কৌশলী।'

(জ) ইয়াতিমের মাল আগুন। সমাজের অপরিণামদর্শী কিছু কিছু লোককে এ আগুন নিয়েও খেলা করতে দেখা যায়। এয়াতিম এবং নাবালেগ উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির প্রভাবশালী আত্মীয়-স্বজনেরা বিভিন্ন কলা-কৌশল অবলম্বন করে আত্মসাৎ করে। এদেরকে বলবো, আপনি যদি আপনার চক্ষুশীতলকারী আদরের শিশু সন্তানটি নিয়ে একটু এভাবে চিন্তা করেন যে, আপনার অনুপস্থিতে সে কি কি অভাবের সম্মুখীন হবে। তাহলে একজন এতিমের মর্মস্পর্শী হৃদয়ের অব্যক্ত কান্না আপনার বিবেককে অবশ্যই ব্যথিত করবে, আপনার উপলব্ধির করুণ মর্মবেদনা আপনার চোখকে অশ্রুসিক্ত করবে। এতিমের মালের ব্যাপারে আল্লাহর বাণী শুনে নিনঃ 'নিশ্চয় যারা এয়াতিমদের মাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে, তারা নিজেদের পেট শুধুমাত্র অগ্নি দ্বারা ভর্তি করছে এবং শীঘ্রই জ্বলন্ত অগ্নীকুন্ডে প্রবেশ করবে।'[২৩] আল্লাহ আরো বলেন, 'এতিমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। উত্তম মালামালের সঙ্গে খারাপ মালামালের বিনিময় করো না এবং তাদের সম্পদকে নিজেদের সম্পদের সাথে সংমিশ্রণ করে তা গ্রাস করো না। নিশ্চয় এটা বড় ধরনের পাপ।'[২৪]
সম্পদশালী ইয়াতিমের লালন-পালনে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ বিধি নিষেধ আরোপ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'ইয়াতিমরা বড় হয়ে তাদের সম্পদ বুঝে নিবে এ ভয়ে সীমালংঘন করে তাদের সম্পদ খেয়ে ফেলো না। সচ্ছল ব্যক্তি যেন তাদের সম্পদ থেকে বেঁচে থাকে। অভিভাবক গরীব হলে প্রচলিত রীতিতে খাবে। ইয়াতিমদের পরীক্ষা করতে থাকো যতদিন না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে। যদি তোমরা তাদের মধ্যে যোগ্যতার সন্ধান পাও তাহলে সম্পদ তাদের হাতে বুঝিয়ে দাও। যখন তাদের সম্পদ হস্তান্তর করবে তখন সাক্ষীদের উপস্থিতিতেই করবে। আর হিসেব নেয়ার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।[২৫] 'তোমরা ইয়াতিমের সম্পদের ধারে কাছেও যাবে না। অবশ্য তারা জ্ঞানবুদ্ধি লাভের বয়সে পৌছার পূর্ব পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা ভালো ও উত্তম পন্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করা যাবে।'[২৬] আল্লাহ তাআলার নির্দেশ 'যে ধনী সে যেন সংযত থাকে। আর যে দরিদ্র, সে যেন ন্যায়সংগত পরিমাণে ভক্ষণ করে।' এ ব্যাপারে মুফাস্সির, ফিকাহবিদ ও ওলামায়ে কেরাম বিশদ ব্যাখা প্রদান করেছেন। আল্লামা ইবনুল জাওযী তার তাফসীরে চারটি মত ব্যক্ত করেছেন, প্রথম মত এই যে, এটা ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে। দ্বিতীয় মত এই যে, যতটুকু তার জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন ততটুকু ভক্ষণ করা যাবে এবং মোটেই অপচয় বা অপব্যয় করা চলবে না। তৃতীয়

মত এই যে, অভিভাবক শুধু তখনই পারিশ্রমিক নিতে পারবে যখন সে ইয়াতিমের জন্য কোন কাজ করে এবং ঐ কাজের পরিমাণের সাথে সংগতি রেখেই নিতে পারবে। চতুর্থ মত এই যে, সে যখন তীব্র প্রয়োজন অনুভব করে কেবল তখনই নিতে পারবে।'[২৭]

(ঝ) দূরবর্তী আত্মীয়-ইয়াতিম ও মিসকীন যাদের মিরাসে কোন অংশ নেই তাদের সাথে যেন হৃদয়হীন ব্যবহার করা না হয়। একটু ইহসান, একটু ঔদার্যের পরিচয় দিয়ে পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তাদেরকেও কিছু দেয়া উচিৎ। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে তারা যেন ফিরে না যায়। যদি এমনটি হয় তবে এর চেয়ে অমানবিক, নির্মম ও হৃদয়বিদারক আচরণ আর কিছুই হতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'ধন-সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারার সময় আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও মিসকিনরা এলে তাদেরকেও ঐ সম্পদ থেকে কিছু দিয়ে দাও এবং তাদের সাথে ভালোভাবে কথা বলো।'[২৮] কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হক ঠিকভাবে দিতে চায় না তাদের উল্লেখিত ওয়াজ ও নসিহত মূল্যহীন।

(ঞ) বিভিন্ন ব্যাংক একাউন্ট ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রভিডেন্ট ফান্ডগুলোর জন্য নমিনী বা মনোনয়ন দানের ব্যাপারেও বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হয়। পরিবারের যে কোন একজন সদস্য যেমনঃ স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, মা-বাবা অথবা ভাইকে নমিনী বা মনোনীত ব্যক্তি নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ব্যক্তির মৃত্যুর পর নমিনী পুরো অর্থই নিয়ে যায়। 'এ ধরনের কাজ ইসলামপূর্ব পথভ্রষ্ট জাতির ঐ অবস্থার সাথে তুলনা করা যায়, যাদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে সম্পূর্ণ সম্পদের মালিক হতো প্রথম সন্তান।[২৯] এ ধরনের অমানবিক ঘটনা আমাদের সমাজ-সংসারে হরহামেশাই ঘটতে দেখা যায়। ইসলামী ব্যাংকগুলোও তাদের একাউন্ট নমিনী দানের ব্যবস্থা রেখেছে। তবে এ ব্যবস্থা অন্যান্য ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান থেকে একটু ভিন্নধর্মী। সেখানে হিসাবদারী মূলত একজন দায়িত্বশীল নিযুক্ত করে থাকে। তার দায়িত্ব হচ্ছে সংশিষ্ট হিসাবদারীর মৃত্যুর পর একাউন্টের সমুদয় টাকা ইসলামী ফারায়েয অনুযায়ী মৃতের উত্তরাধিকারীদের ভাগ করে দেয়া। কিন্তু বাস্তবতা তো তার বিপরীত। হিসাবধারীর মৃত্যুর পর কি আসলে তা ভাগ করে দেয়? এখানে ব্যাংকগুলো নিজেদের দায়িত্বের বোঝা হিসাবদারীর ঘাড়েই চাপিয়ে দেয়। আমি মনে করি এ ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো মানবিক দিক বিবেচনায় এনে সঠিক ওয়ারিশগণের মধ্যে সম্পদ ভাগ করে দেয়ার দায়িত্বটুকু গ্রহণ করতে পারে। আমাদের দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন হিসাবদারীর ওপর এ ধরনের বোঝা চাপানোর পরিবর্তে ইসলামের মীরাসী আইন সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করা উচিত। সূরা নিসার প্রথম দিকে বলা হয়েছে, এগুলো আল্লাহর দেয়া সীমারেখা, এ সীমা লংঘন করার স্পর্ধা না দেখানোর জন্যও কঠোর ভাষায় হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে।

(চ) আমাদের সমাজ সংসারে প্রচলিত উল্লেখিত নিষিদ্ধ কাজগুলো পরিহার করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করব। মনে রাখবেন, আপনি যে মৃত ব্যক্তিটির উত্তরাধিকারী হয়েছেন, সেখানে আপনাকেও যেতে হবে। প্রতিটি কৃতকর্মের জবাব আপনাকে দিতে হবে। দুনিয়ার সম্পদের লোভে যে হৃদয়হীন ব্যবহার আপনি করেছেন, যেদিন আদেশ-ফয়সালার সকল ক্ষমতার দণ্ড একমাত্র

আল্লাহর হাতে থাকবে, সেদিন যদি আপনার সাথে একই ব্যবহার করা হয়, তখন আপনার কি হবে? আল-কুরআনে মিরাসী আইন বর্ণনা করার পর সূরা নিসার ১৩-১৪ আয়াতে বলা হয়ঃ 'এগুলো হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, তাকে আল্লাহ এমন বাগিচায় প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানি করবে এবং তার নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করে যাবে, আল্লাহ আগুনে ফেলে দেবেন। সেখানে সে থাকবে চিরকাল, আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা ও অপমানজনক শাস্তি।' সুতরাং মিরাস বন্টনে আল্লাহর সীমারেখা অতিক্রম করবেন না। বরং সর্বক্ষেত্রে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করুন।

*১০. নারী অধিকার নিয়ে যারা ইসলামের সমালোচনা করেন তাদের উদ্দেশ্যে*

উপরে ইসলামসহ পৃথিবীর বড় বড় কয়েকটি ধর্ম তথা খৃষ্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধদের মীরাসী আইনে নারীর অধিকারের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটু চিন্তা করুন, তুলনামূলকভাবে আর্থিক অধিকারের দিক থেকে ইসলাম কতটুকু এগিয়ে। আর সার্বিকভাবে ইসলাম নারীকে অধিকার প্রদানের দিক থেকে যতটুকু উপরের দিকে নিয়ে গেছে, অন্যান্য ধর্মে ততটুকু বা ক্ষেত্র বিশেষে তার চেয়েও অধিক নিচের দিকে নিয়ে গেছে। ইসলাম নারীকে যতটুকু সম্মান ও ইজ্জতের আসনে আসীন করেছে, অন্যান্য ধর্ম তাদেরকে শুধু বঞ্চিত ও লাঞ্ছিতই করেনি বরং বিভিন্নভাবে তাদেরকে অসম্মান ও অপমানিত করেছে। সেগুলো আমাদের জ্ঞানপাপী দৃষ্টিভ্রম ভাইদের নজরে আসে না। তারা সকল প্রকার লজ্জার মাথা খেয়ে শুধু শুধুই ইসলামের পিছনে লেগে থাকে। পাওয়ারফুল কাঁচ দিয়ে ইসলামের দোষত্রুটি আবিষ্কারের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। মোটা মোটা অক্ষরে লিখা অন্যান্য ধর্মে নারীদের মীরাসী আইনের দোষত্রুটিগুলো তাদের নজরে আসে না। জীবনস্বত্ব নামক অপমান ও লাঞ্ছিতমূলক উত্তরাধিকার প্রদান করে নারীকে কোথায় নিয়ে যাওয়া তা তাদের নজরে আসে না। সপিণ্ডের দীর্ঘ তালিকায় নারীকে এমন ক্রমধারায় স্থান দেয়া হয়েছে যে, তাদের না পাওয়ার সম্ভবনাই অধিক। পিতার বর্তমানে মাতার
বঞ্চিত হওয়ার খৃস্ট আইনের প্রতি এ সমস্ত বোধহীনেরা বড়ই অন্ধ। কপাল পুরা কিছু মুসলমান বুদ্ধিজীবি ও সমাজপতি, এনজিও কর্তা এবং রাজনীতিকও ইসলামের মীরাসী আইনের দোষ খুঁজে ফেরে।

সকলের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, ইসলামের মীরাসী আইনে কোন অবস্থাতেই নারীর অধিকারকে খর্ব করা হয়নি। বরং ইসলামই নারীকে মীরাসের অধিকার দিয়ে সম্মানিত করেছে। ইসলামের মীরাসী আইন সমাজ ও রাষ্ট্রে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হলে অবহেলিত নারী সমাজ সকল প্রকার লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি পেত। আর নারীরা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হলে তারা অনেকের দুর্ব্যবহার থেকেও রক্ষা পেত। এবং এর ফলে তাদের অন্যান্য অধিকার ও মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হতো।

কিন্তু তা না করে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ঘোষিত মীরাসী আইন পরিবর্তন করে অথবা তাঁর কিতাবে অন্যান্য যে সমস্ত আইনগত সুস্পষ্ট সীমা নির্ধারণ করেছেন সেগুলো ভেঙ্গে ফেলে ও আল্লাহর চিরন্তন আযাবের ভয় দেখানোর পরও অপরিণামদর্শী কোন কোন মুসলমান ব্যক্তি ও শাসক ইহুদীদের কায়দায় নিলর্জ্জভাবে আল্লাহর আইনে পরিবর্তনের অপচেষ্টা করেছে এবং তাঁর সীমারেখা ভেঙ্গে ফেলার দুঃসাহস দেখিয়েছে। এদের সাথে যুক্ত হয়েছে কিছু সংখ্যক তথাকথিত বুদ্ধিজীবী। মীরাসী আইনের ব্যাপারে যে নাফরমানী করা হয়েছে তা আল্লাহর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিদ্রোহের শামিল। সুতরাং আসুন নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের মীরাসী আইন প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হই। কোনক্রমে যেন আমরা আল্লাহর সীমা অতিক্রম না করি। আল্লাহ্ তাআলা যেন আমাদেরকে তাঁর আইন ভেঙ্গে সীমা লংঘকারীদের কাতারে শামিল না করেন। আমীন।

*তথ্যপঞ্জি :*

১. মোহাম্মদ নুরুল আমিন, মাসিক জিজ্ঞাসা- মে ২০০৭।

২. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত ১১।

৩. তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৯, সাইয়েদ কতুব শহীদ, অনুবাদ হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ, আল কুরআন একাডেমী, লন্ডন।

৪. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত ৭।

৫. দৈনন্দিন জীবনে আইন, ব্র্যাক মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচী, পৃষ্ঠা ৪০-৪৩, প্রস্তুতকারক: এলিনা জুবাইদি বেবী, কাজী নজরুল ইসলাম সাধন কুমার নন্দী, প্রথম প্রকাশ ১লা এপ্রিল,২০০৩।

৬. দৈনন্দিন জীবনে আইন, ব্র্যাক মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচী, পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫, প্রাগুক্ত।

৭. ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার, ফজলুর রহমান, আই. আর .এস পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৫।

৮. দৈনন্দিন জীবনে আইন, ব্র্যাক মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচি, পৃষ্ঠা ৪২-৪৮, প্রাগুক্ত।

৯. ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার, ফজলুর রহমান, আই. আর .এস পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৫।

১০. খৃস্টান পারিবারিক আইন, পৃষ্ঠা ৬-৯, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০০, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ২৬/৩, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা। যখন মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি, পিতা এবং কোনো ভাই বা বোন না থাকে তখনই কেবল মাতা নিজের মৃত সন্তানের উত্তরাধিকারী হবে। অর্থাৎ মৃতের সন্তান, পিতা, ভাইবোনদের মধ্যে কেউ জীবিত থাকলে মাতা বঞ্চিত হবেন। এখানে সন্তানের উপস্থিতিতে অন্য সকলেই বঞ্চিত হবেন এ যুক্তি মেনে নেয়া যায়, তাই বলে পিতা

অথবা ভাই বোনের উপস্থিতিতে মাতা বঞ্চিত হবেন তা কোন যুক্তিতে পড়ে না। এখানে আমরা বৈষম্য বা অসামঞ্জস্যতা দেখতে পাই। বরং মাতার উপস্থিতিতে ভাইবোন বঞ্চিত হওয়ার দরকার ছিল। কারণ মাতার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির মালিক এরাই হতো।

১১. প্রাগুক্ত।
১২. মিশকাত পৃষ্ঠা ১২০-১২৩, ৬ষ্ঠ খণ্ড, মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী র. এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লিঃ পুনর্মুদ্রণ (৫) জুন-২০০৬।
১৩. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত ১১-১২।
১৪. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত-১৭৬।
১৫. ফিকহুল মাওয়ারিস, পৃষ্ঠা ৭৫, শেখ ইবনে আছিমিন, দারে ইবনে জাওজী, মিশর।
১৬. ফিকহুল মাওয়ারিস, পৃষ্ঠা ৪০, প্রাগুক্ত।
১৭. সিরাজী : মুহাম্মদ আবু তাহের সিরাজী র.।
১৮. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত ১২৭।
১৯. তিরমিযি, আবু দাউদ।
২০. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত ১১।
২১. ইবনে মাজাহ।
২২. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত ৭।
২৩. ইবনে মাজাহ।
২৪. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত ২।
২৫. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত ৬।
২৬. আল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত ১৫২।
২৭. কবীরা গুনাহ, পৃষ্ঠা ৫৩, ইমাম আয্যাহাবী, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৯৬, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।
২৮. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত ৮।
২৯. মিশকাত পৃষ্ঠা ১১৯, ৬ষ্ঠ খণ্ড, মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী র. এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লিঃ পুনর্মুদ্রণ (৫) জুন-২০০৬।

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৮
বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৩, পৃষ্ঠা : ৫৭-৭০

# দীন শব্দের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য

ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম

## দীনের আভিধানিক অর্থ

দীন শব্দটির অর্থ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা যখন আরবী অভিধানগুলোর প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করি[১] তখন দেখি 'দীন' শব্দটি সেখানে বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন রাজ্য, ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি, মর্যাদা, নমনীয়তা, আনুগত্য, ধর্ম, চরিত্র ইত্যাদি।

আবার যখন শব্দটির গঠন প্রনালী ও ধাতু রূপের প্রতি দৃষ্টি দেই তখন আমরা সেখানে তিনটি অর্থ পাই। এ অর্থগুলোর একটির সাথে অন্যটির অনিবার্য সম্পর্ক রয়েছে। এক্ষেত্রে কখনো দীন শব্দটি সকর্মক ক্রিয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। বলা হয় 'ইউদ্‌নীহে' তাকে বদলা দেয়া হয়েছে। আবার লাম সংযোগ সহকারে, সকর্মক ক্রিয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন 'দানা লাহু' সে নিজেকে বদলা দিয়েছে। আবার কখনো 'বা' সংযোগ সহকারে সকর্মক ক্রিয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় 'দানা বিহি'। সে বদলা দিয়েছে। আবার শব্দটির উৎসের বিভিন্নতার কারণে তার ভেতরের চেহারাও বদলে যায়, যার ফলে তার বাচ্য, কাল ও ক্রিয়া প্রকরণের মধ্যেও পরিবর্তন সূচিত হয়। যেমন আমরা বলি : 'দানাহু দাইনান।' অর্থাৎ সে তাকে বদলা দিয়েছে যেমন বদলা দিতে হয়। এর উদ্দেশ্য হয়, সে ঐ জিনিসটির মালিক হয়েছে, সেটির ওপর কর্তৃত্ব ও অধিকার লাভ করেছে, সেটি পরিচালনা করছে, তার ওপর নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তাকে বৈধ করে নিয়েছে। মালিকি ইয়াওমিদ দীন অর্থাৎ 'বদলা দেবার দিনের মালিক' বাক্যের মধ্যেও দীন শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত এখানে দীন শব্দটির ব্যবহারও রাজার পক্ষ থেকে ক্ষমতার ব্যবহার বুঝাচ্ছে। তিনি তাঁর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ব্যবহার করছেন এবং হিসাব নিকাশ করছেন ও প্রতিদান দিচ্ছেন। হাদীসে বলা হয়েছে : আল কাইয়েসু মান দানা নাফসাহু –'বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে নিজেই নিজের প্রতিদান দেয়।'[২] অর্থাৎ যে নিজের ওপর কর্তৃত্বশালী, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং নিজেকে যথাযথ প্রতিদান দেয়।

যখন আমরা বলি : 'দানা লাহু' তখন এর উদ্দেশ্য হয়, সে তার আনুগত্য করলো এবং তার জন্য নত হলো। এখানে দীন শব্দের অর্থ হয় বিনত হওয়া, আনুগত্য করা, ইবাদত করা। ইয়াকুনুদ্ দীনু লিল্লাহে– বাক্যে হুকুম ও আনুগত্য এ দুটি অর্থ গ্রহণ করা সঠিক হবে। এখানে দ্বিতীয় অর্থটি প্রথমটির অনুগামী ও সহযোগী। বলা হয় : দানাহু ফাদানা লাহু অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগ করে তাকে অনুগত করেছে এবং সে নত হয়েছে ও অনুগত হয়েছে।

আর যখন আমরা বলি, 'দানা বিশশাইয়ে' তখন এর উদ্দেশ্য হয় : সে তাকে গ্রহণ করেছে দীন ও মযহাব রূপে। অর্থাৎ তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে অথবা তার রঙে রঙীন হয়েছে। এক্ষেত্রে দীন হচ্ছে : মানুষ যা সহজ করে নেয়, চিন্তাগতভাবে বা কর্মগতভাবে। যেমন 'হাযা দাইনী ওয়া দাইদানী' এ হচ্ছে আমার ঋণ এবং আমার অভ্যাস।

এখান থেকে আমরা জানছি যে, এর তৃতীয় ব্যবহারটি পূর্ববর্তী দুটি ব্যবহারের অনুগামী। কারণ অভ্যাস বা বিশ্বাস, যা দীনের সাথে সম্পৃক্ত, তা এক ধরনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব এবং তার সহযোগীর ওপর আধিপত্য বিস্তার, যা এক পর্যায়ে তাকে বিনত করে, যার ফলে সে তার অনুগত হয়।[৩]

মোটকথা আরবী ভাষায় 'দীন' শব্দটি দুই পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের প্রতি ইংগিত করে। দীন তাদের এক পক্ষকে উন্নত এবং অন্য পক্ষকে বিনত করে। প্রথম পক্ষ যখন বিনত হয় তখন দ্বিতীয় পক্ষ হয় উন্নত, ক্ষমতাশালী ও আধিতপ্য বিস্তারকারী। আর দীন যখন উভয় পক্ষের মধ্যে পূর্ণাংগ সম্পর্ক স্থাপন করে তখন তা আকীদা, বিশ্বাস ও ধর্মে পরিণত হয় এবং এর মাধ্যমে গড়ে ওঠে আচার-আচরণ ও আইন বিধান, যার ফলে ঐ সম্পর্ক একটি সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত রূপ লাভ করে। ধাতুগত দিক দিয়ে 'দীন' শব্দের অর্থ হয় অপরিহার্য আনুগত্য এবং এ আনুগত্যের পেছনে থাকে শক্তি প্রয়োগ ও কর্তব্যপরায়ণতা। যেমন 'দাইন' শব্দটিও একই অর্থে অবস্থান করে। 'দাইনুন' অর্থাৎ ঋণদাতা প্রভাবশালী হয় ঋণগ্রহীতার ওপর। অন্যদিকে ঋণগ্রহীতা অনুগত ও বিনত থাকে। এভাবে দীন শব্দের আভিধানিক অর্থ হয় অনুগত ও বিনত হওয়া।

### *শরীয়তের আলেমগণের দৃষ্টিতে 'দীন'-এর সংগা*

শরীয়তের জ্ঞান সম্পন্ন আলেমগণ দীন শব্দের সংগা এভাবে নির্ণয় করেছেন : আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত এমন একজন পরিচালক যে ভারসাম্যপূর্ণ বুদ্ধির অধিকারীদেরকে পরিচালনা করে তাদের প্রশংসনীয় ক্ষমতার সাহায্যে তাদের পার্থিব জীবনকে কল্যাণের দিকে এবং পরকালীন জীবনকে সাফল্য ও উন্নতির দিকে।[৪]

এখানে 'আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত' বলা হয়েছে। এর ফলে মানুষের পক্ষের ক্ষমতা বাতিল হয়ে গেছে। কারণ মানুষ বুদ্ধির ভিত্তিতে অথবা সংস্কার ও বিভ্রমে আক্রান্ত হয়ে সবকিছু গ্রহণ করে। এগুলো আসলে দীন নয়, যদিও দীন শব্দ তার জন্যও ব্যবহার হয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে : 'ইসলাম ছাড়া অন্য দীন যে ব্যক্তি গ্রহণ করবে তার সে দীন কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'[৫]

এখান থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছে যাই যে, সত্য দীন প্রদান করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা মানুষের নেই। মানুষের বুদ্ধি, সংস্কারবোধ বা কল্পনা প্রবণতা এ যোগ্যতা রাখে না। অহীর মাধ্যম ছাড়া এ পদ্ধতিতে যা কিছু তার কাছে এসে পৌছুবে সবই বাতিল এবং আল্লাহর কাছে অগ্রহণযোগ্য।

শিল্প, অর্থনীতি ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানুষ যেসব মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করে সেগুলোও সত্য দীনের সন্ধান লাভে ব্যর্থ। অন্যদিকে 'ভারসাম্যপূর্ণ বুদ্ধির অধিকারী' শব্দগুলোর মাধ্যমে স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত বুদ্ধিবৃত্তি এবং প্রাণীকূলের স্বাভাবিক

প্রেরণা ও অনুপ্রেরণা শক্তি, যার সাহায্যে তারা নিজেদের কল্যাণ লাভ ও অকল্যাণ থেকে মুক্ত হতে সমর্থ হয়, তা দীন-এর সংগার বাইরে চলে যায়। আর 'তাদের প্রশংসনীয় ক্ষমতা' শব্দাবলীর মাধ্যমে ঘটনাক্রমে ও বাধ্যগতভাবে মানুষ ভাল বা মন্দ স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির ন্যায় অন্যান্য যা কিছু অর্জন করে তাও দীন এর সংগার আওতা বহির্ভূত হয়।

এ থেকে আমরা জানতে পারি যে, যথার্থ পরিপূর্ণতার অর্থে দীন কখনো জোর করে বা জবরদস্তি অর্জিত হয় না। সম্ভবত মহান আল্লাহর এ বাণী 'দীনের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই' এই সত্যের প্রতি ইংগিত করছে। 'লা' তথা 'নেই' শব্দটি এখানে স্রেফ না-সূচক হোক অথবা তাকে আমরা নিষিদ্ধ অর্থে ব্যবহার করি না কেন উভয়ই ক্ষেত্রে 'না-সূচক' অর্থ করলে যে ফলাফল হবে 'নিষিদ্ধ' অর্থ করলে সেক্ষেত্রে নিষিদ্ধতা না-এর কারণ হিসাবে আবির্ভূত হবে এবং তার ফলও হবে জোর-জবরদস্তির পথে দীন অর্জন না করা। কাজেই জোর জবরদস্তি করে দীন অর্জন করলে কোনো ফায়েদা নেই।

আলেমগণ এ আয়াতটির অর্থ গ্রহণে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন এটা কোনো আপত্তির বিষয় নয়। একদলের মতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আবরদেরকে দীন ইসলাম গ্রহণ করার জন্য জোর খাটালেন এবং তাদের ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া আর কিছুতে রাজি হলেন না আল্লাহর এ আয়াতের ভিত্তিতে 'হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ করো'[৭] তখন লা-ইকরাহা ফিদদীন এর আয়াতটি 'মান্‌সুখ' তথা রহিত হয়ে গেছে। অন্যদল বলেন, আয়াতটি 'মানসুখ' হয়নি। বরং এটি বিশেষভাবে আহলি কিতাবদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছিল। তারা জিযিয়া কর দিতে রাজি হলে তাদেরকে আর ইসলাম গ্রহণের জন্য জোর দেয়া হতো না। অবশ্য মূর্তি পূজারীদের ওপর জোর খাটানো হতো। ইসলাম গ্রহণ ছাড়া তাদের থেকে আর কিছুই গ্রহণীয় ছিল না।

তৃতীয় একদলের মতে আয়াতটি আনসারদের ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছে। কারণ আনসারদের কোনো কোনো ছেলে ইহুদী ভাবাপন্ন হয়ে গেলে তাদের মায়েরা তাদের সাথে বাস করা কঠিন মনে করতো। কাজেই মায়েরা হয়ে যেতো ছেলেদের থেকে বিচ্ছিন্ন। যেমন বনী নাযীরের মধ্যে আনসারদের অনেক যুবক বসবাস করতো। তারা বললো, আমরা আমাদের সন্তানদের আহ্বান করবো না ইসলামের দিকে। এ প্রসংগে এ আয়াতটি নাযিল হয়।

অন্য এক দলের মতে আয়াতটি নাযিল হয় বন্দীদের প্রসংগে। বন্দী আহলি কিতাব এবং বয়স্ক ও প্রবীণ হলে তাদের ওপর জোর খাটানো হতো না। আর যদি তারা অল্প বয়স্ক বা প্রবীণ অগ্নি পূজারী ও মূর্তিপূজারী হতো তাহলে তাদের ইসলাম গ্রহণের জন্য জোর খাটানো হতো। কারণ তাদের মালিকরা তাদের থেকে লাভবান হতে পারতো না। মূর্তিপূজক হবার কারণে তাদের জবাই করা প্রাণী খাওয়া যেতো না, তাদের মেয়েদের সাথে সংগম করা যেতো না, তারা মৃত প্রাণী খেতো এবং আরো বিভিন্ন নাপাকির সাথে তারা জড়িত ছিল।[৮]

বলা হয়, আনসারদের আবু হুসাইন নামক এক ব্যক্তি প্রসংগে এ আয়াতটি নাযিল হয়। তার দুই ছেলেকে মদীনায় আগত সিরিয়ার কিছু ব্যবসায়ী খৃস্ট ধর্ম গ্রহণের দাওয়াত দেয়। তারা দুজন

খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে তাদের সাথে সিরিয়ায় চলে যায়। তাদের বাপ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাদেরকে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনার আবেদন জানায়। এ প্রসংগে এ আয়াতটি নাযিল হয়।

এ সমস্ত বক্তব্যে বাহ্যিক ও প্রকাশ্য জোর জবরদস্তিমূলক বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। যার ফলে ইসলামের আকীদা বিশ্বাসের সাথে সম্পর্ক না রেখেও কথায় ও কর্মে ইসলামের বাহ্যিক বিধি-বিধানের অধীনতা স্বীকার করে তার মধ্যে প্রবেশ করা হয়। আর আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে জোর-জবরদস্তি করে তা অর্জিত হয় না।

এখন আয়াতটি আনসারদের প্রসংগে বা তাদের ব্যক্তি বিশেষের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে বলে যে তা শুধু ঐ বিশেষ প্রসংগেই প্রযোজ্য এমন নয়। কারণ কেবল আয়াতে উল্লেখিত বিশেষ কার্যকারণ নয় বরং শাব্দিক ব্যাপকতার মধ্যেই তার শিক্ষা নিহিত। অ-আহলি কিতাবদের প্রসংগে আয়াতটি আসলে কেবলমাত্র বাহ্যিক জবরদস্তি অর্থেই নাযিল হয়। অন্যদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবের মুশরিকদের জন্য ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু মেনে নেননি। সম্ভবত মুশরিকরা ইতোপূর্বে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা চালিয়েছিল এ ছিল তারই ফল। অথবা তারা অন্যের জন্য শিক্ষনীয় স্থানে অবস্থান করছিল। ফলে তাদের বাহ্যত হলেও ইসলামের বিধানের আওতাধীন হওয়া জরুরি ছিল। অথবা তারা বা অন্যান্য মুশরিক অগ্নিপূজক ও মূর্তিপূজারী সম্প্রদায়গুলো আল্লাহর আয়াতের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল এবং কুফরী ও কুসংস্কারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। কাজেই তারা বাহ্যত হলেও ইসলামী বিধানের ছায়াতলে এসে গেলে তার নিকটতর হবার সুযোগ লাভ করে। ফলে সচেতনভাবে পূর্ণ ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে।

'পার্থিব জীবনকে কল্যাণের দিকে' অর্থ হচ্ছে পার্থিব সুখ এবং 'পরকালীন জীবনকে সাফল্য ও উন্নতির দিকে' অর্থ হচ্ছে পরকালীন সুখ। এ সুখ অর্জিত হয় ব্যক্তির বেহেশতের চিরস্থায়ী নিয়ামত লাভ এবং জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তির মাধ্যমে।

এই বিস্তারিত আলোচনার পর এখন বলা যেতে পারে যে, দীন হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত একটি পদ্ধতি, যা তিনি তাঁর রসূলদেরকে প্রদান করেছেন মানুষকে পরিচালিত করার জন্য বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সত্য ও ন্যায়ের পথে এবং আচরণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে কল্যাণের পথে। আর ঐ পদ্ধতি ও অধীনতার আওতাধীন হয়ে সে কতিপয় আদেশ ও নিষেধের বিধান লাভ করে, যা তার দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের বার্তা বহন করে আনে।

### *দীন শব্দের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থের মধ্যে সম্পর্ক*

ইতিপূর্বে বলেছি দীন শব্দের সুস্পষ্ট আভিধানিক অর্থ হচ্ছে : অধীনতা ও আনুগত্য। এ অর্থটি দীনের শরয়ী অর্থের সাথে একাত্ম হয়ে গেছে। তবে শরয়ী অর্থটির পরিসর আভিধানিক অর্থের তুলনায় কিছুটা সংকীর্ণ। কারণ অধীনতা শব্দটি কখনো আল্লাহর জন্য, আবার কখনো গায়রুল্লাহ যেমন মানুষ, পাথর, পশু, নক্ষত্র, চন্দ্র ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে শরয়ী অর্থে দীন শব্দটি কেবলমাত্র এক আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়।

তারপর অধীনতা শব্দটি আভিধানিক অর্থে বাহ্যিক অধীনতা প্রকাশ করে। কারণ এর পেছনে রয়েছে জোর ও শক্তি প্রয়োগ। আর আন্তরিক অধীনতা হয় একমাত্র আল্লাহর জন্য। আল্লাহর অধীনতা বাহ্যিক ও আন্তরিক উভয় দিক দিয়েই হয়। এখান থেকেই ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত অধীনতার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়।

যদি আমরা সামগ্রিকভাবে মহাশূন্য জগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে দেখি এই মহাশূন্য জগত তার বিপুল ব্যবস্থাপনা, পরিসর, গতিশীলতা ও বিস্তারসহ একটি জবরদস্ত শক্তির অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। সেখানে প্রত্যেকটি জিনিস পরিমাণমত অবস্থান করছে এবং তাদের সংখ্যা অগণিত। প্রত্যেক্যের একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে এবং সেই মেয়াদ কেউ অতিক্রম করছে না। এভাবে যদি আমাদের এই ভূপৃষ্ঠের দিকে তাকাই তাহলে এখানে দেখি সূর্য ও নক্ষত্ররাজি থেকে একটি বিশেষ দূরত্ব বজায় রেখে নির্দিষ্ট পরিমাণ আলো, উত্তাপ, বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ইত্যাদিসহ এ গ্রহটি তার কক্ষপথে এগিয়ে চলছে। অনুরূপভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রাণীকূলের প্রতি তাকালে আমরা দেখি, তারা প্রত্যেকে বার্ধক্য ও জরার আইনে বাঁধা এবং তারপর অবশেষে প্রকাশ্য মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

এ সবই প্রাকৃতিক অধীনতার প্রভাব। এর কিছুটা সচেতন এবং কিছুটা অসচেতন ও বাধ্যতামূলক। যেমন উর্ধাকাশে যে উড়ে বেড়ায় সে আসলে বায়ুমণ্ডলের অধীনতা স্বীকার করেছে। ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত হোক এর মধ্যে তাকে ঘুরে বেড়াতে হবে। তবে ভক্তের অধীনতা সচেতন ও ইচ্ছাকৃত উভয়ই। যখন সে তার মাবুদের সামনে নত হয় এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব স্বীকার করে নিয়ে তাঁকে সিজদা করে তখন মনের তাগিদেই তা করে ঘৃণা মিশ্রিত অনিচ্ছা সহকারে নয়। কারণ সে শক্তি প্রয়োগের প্রভাব অস্বীকার করে পবিত্র মানসিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই এ কাজে ব্রতী হয় এবং সন্তুষ্টচিত্তে যথার্থ পাত্রে এ অধিকার দান করে।[৯]

ইবাদত-বন্দেগী ও পূজা-উপাসনার মাধ্যমে যে অধীনতা স্বীকার করা হয় এবং সাধারণ দাসত্বের মাধ্যমে যে অধীনতার স্বীকৃতি দেয়া হয় এখান থেকেই তার মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরই ইংগিত বহন করছে মহান আল্লাহর বাণী : 'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর সামনে সিজদানত হচ্ছে স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায়।'[১০]

এ থেকে আমরা জানতে পারি, দীন শব্দটি যখন আভিধানিক অর্থে দীনদারী ও ধর্মপরায়ণতা অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন তার মধ্যে সব ধরনের অধীনতা ও আনুগত্য শামিল হয়ে যায়। অন্যদিকে এর শরয়ী অর্থের মধ্যে এক আল্লাহর অধীনতা প্রকাশ পায়। আর এ অধীনতা ও আনুগত্য হচ্ছে আল্লাহর বিধানের যা তিনি নাযিল করেছেন। তার মাধ্যমে তাঁর ইবাদত করতে হবে এবং সঠিক পথে চলতে হবে।

## *পূর্ণাঙ্গ দীনের তাৎপর্য ও স্বরূপ*

### *আল্লাহর কাছে এটিই একমাত্র দীন এবং মানুষের জন্য এর প্রয়োজন*

### *পূর্ণাঙ্গ দীন*

ঈমান, ইসলাম, বিশ্বাস ও কর্ম সমন্বয়ে পূর্ণাংগ দীন গড়ে ওঠে। ইসলাম ও ঈমান শব্দ দুটির পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। সংক্ষেপে তাঁদের বক্তব্য এখানে উল্লেখ করছি ঃ

এক দলের মতে ঈমান ও ইসলাম দুটি সমার্থক শব্দ। অন্য দলের মতে দুটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। তৃতীয় দল বলেন, শব্দ দুটি পরস্পর পরিপূরক। এই অর্থের ভিন্নতার কারণ হচ্ছে এই যে, শব্দ দুটি কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ও বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ কারণে আলেমগণের মধ্যে এর অর্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও মতবিরোধ দেখা দিয়েছে।

এ শব্দ দুটিকে আমরা তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবো।

এক. আভিধানিক অর্থে শব্দ দুটির উদ্দেশ্য ও ভাবার্থ।

দুই. শরীয়তের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ।

তিন. শরীয়তের বিধানে এর ব্যবহার।

আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে ঈমান বলা হয় বিশ্বাসকে। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'কিন্তু তুমি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবে না।'[১১] আর ইসলাম বলা হয় আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্য সহকারে বশ্যতা স্বীকার করা ও বাধ্য হওয়াকে। কালব বা হৃদয় ও অন্তর বিশ্বাসকে ধারণ করে। জিহ্বা হচ্ছে তার মুখপত্র। অন্যদিকে আত্মসমর্পণ করা ও আনুগত্য করার বিষয়টি অন্তর, জিহ্বা ও শরীরের সমস্ত অংগ প্রত্যংগ সবার ক্ষেত্রে সমান। কারণ অন্তর যা বিশ্বাস করে তার কাছে আত্মসমর্পণ করা হয়। জিহ্বার সাহায্যে তার স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং শরীরের সমস্ত অংগ প্রত্যংগ দিয়ে তার আনুগত্য করা হয়। কাজেই শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে ইসলাম ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং ঈমান বিশেষ ক্ষেত্রে। এভাবে ঈমান ইসলামের শ্রেষ্ঠতম অংশে পরিণত হয়। ফলে প্রত্যেকটি বিশ্বাসের পরে আসে আনুগত্য কিন্তু প্রত্যেকটি আনুগত্যের পেছনে বিশ্বাস থাকে না। কাজেই আভিধানিক দিক দিয়ে ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে শর্তহীন ব্যাপকতা ও বিশিষ্টতার সম্পর্ক বিদ্যমান।[১২]

### *শরয়ী প্রয়োগের দৃষ্টিতে*

ইসলাম ও ঈমান শব্দ দুটি কখনো সমার্থক, কখনো ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এবং কখনো পরিপূরক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

সমার্থক যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'সেখানে যেসব মুমিন ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম। এবং সেখানে একটি পরিবার ছাড়া কোনো মুসলিম তথা আত্মসমর্পণকারী আমি পাইনি।[১৩]

মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'মূসা বললো, হে আমার জাতি! যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাকো তাহলে তাঁর ওপর ভরসা করো যদি তোমরা মুসলিম তথা আত্মসমর্পণকারী হও।[১৪]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, জবাবে তিনি ঐ পাঁচটি বুনিয়াদের কথা বললেন।

ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর বাণী উদ্ধৃত করা যায় : গ্রামীণ আরবরা বললো, আমরা ঈমান এনেছি। (হে মুহাম্মদ!) বলে দাও, তোমরা ঈমান আনোনি বরং তোমরা বলো,

আমরা মুসলিম হয়েছি।[১৫] অর্থাৎ তোমরা বলো, আমরা বাহ্যত মুসলিম হয়েছি। এখানে ঈমান মানে অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং ইসলাম মানে কণ্ঠ ও অংগ প্রত্যংগের সাহায্যে বাহ্যত ইসলামের বশ্যতা স্বীকারের কথা প্রকাশ করা।

আর পরিপূরক অর্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস বর্ণনা করা যায়। 'তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো : শ্রেষ্ঠ কাজ কি? জবাব দিলেন : ইসলাম। প্রশ্নকর্তা আবার জিজ্ঞেস করলো : কোন ইসলাম শ্রেষ্ঠ? জবাব দিলেন : ঈমান।' এখানে ইসলাম ও ঈমান একদিকে ভিন্ন অর্থ এবং অন্যদিকে পরিপূরক অর্থ প্রকাশ করছে। আভিধানিক অর্থে এটিই ইসলাম ও ঈমানের সর্বাধিক সহযোগিতামূলক ব্যবহার। কারণ ঈমান এখানে আমলের অন্তরভুক্ত হয়ে গেছে এবং তা ইসলাম। অন্যদিকে ইসলাম হচ্ছে আত্মসমর্পণ। এ আত্মসমর্পণ অন্তরের সাহায্যে এবং কণ্ঠ ও অংগ প্রত্যংগের সাহায্যেও। আর এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আত্মসমর্পণ তথা ইসলাম হচ্ছে অন্তর দিয়ে এবং তা হচ্ছে বিশ্বাস।[১৬]

উমদাতুল কারী গ্রন্থের লেখকের মতে, ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে ব্যাপকতা ও বিশিষ্টতর সম্পর্ক আছে একদিক দিয়ে। কারণ ঈমানও কখনো কখনো ইসলাম ছাড়া পাওয়া যায়। যেমন জনমানবহীন সুউচ্চ পর্বতশৃংগে বসবাসকারী নিসংগ এক ব্যক্তি। তার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাবার আগেই সে নিজের হৃদয়ের অনুভূতি ও স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে আল্লাহর অস্তিত্ব ও গুণাবলী অনুধাবন করতে পারলো। অনুরূপভাবে একজন কাফের ঈমান যা কিছুকে অপরিহার্য করে এমন সবকিছুকে সে চূড়ান্তভাবে বিশ্বাস করলো এবং তারপর একদিন একথা কণ্ঠে উচ্চারণ করার আগে আকস্মিক মৃত্যুবরণ করলো।[১৭] এহইয়াউল উলুমুদ্দীন গ্রন্থে ইমাম গাযালী এবং মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে ইমাম নববী এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন।

ইরশাদুল বারী গ্রন্থে বলা হয়েছে, ন্যায়ত ঈমান ইসলাম বিহীন হতে পারে না। এ দুটি পরস্পর সত্যের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ। তাদের অন্তরনিহিত অর্থের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে ঠিকই। কারণ ঈমান বলা হয় আন্তরিক বিশ্বাসকে এবং ইসলাম বলা হয় অংগ প্রতংগের কার্যক্রমকে। তবে সামগ্রিকভাবে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো ব্যক্তিকে মুমিন বলা হবে কিন্তু মুসলিম বলা হবে না অথবা মুসলিম বলা হবে কিন্তু মুমিন বলা হবে না এমনটি সঠিক নয়।[১৯]

এ ছিল শরীয়তের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শব্দ দুটি প্রয়োগের ব্যাপারে শরীয়ত অভিজ্ঞ কতিপয় আলেমের অভিমত। ইসলাম ও ঈমানের বিধান ইহকালীন ও পরকালীন দুভাগে বিভক্ত। পরকালীন বিধানে রয়েছে জাহান্নাম থেকে বের হওয়া এবং তার মধ্যে চিরকাল না থাকা। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তির দিলে একটি ক্ষুদ্র বালুকণা পরিমাণও ঈমান থাকবে সে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে।' এ হুকুমটি কিসের ভিত্তিতে কার্যকর হবে এ ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কারোর মতে নিছক আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে এর নিস্পত্তি হবে। আবার অন্যদের মতে অন্তরের বিশ্বাস, কণ্ঠের সাক্ষ্যদান এবং অংগ-প্রত্যংগের কার্যক্রমের ভিত্তিতে এর ফায়সালা হবে।[১৯]

মোটকথা সর্বাবস্থায় অন্তরের বিশ্বাস, কণ্ঠের সাক্ষ্যদান ও অংগ-প্রত্যংগের কর্মকাণ্ড এসবগুলোর পারস্পরিক সংযোগের ভিত্তিতেই এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, এ ব্যাপারে কারোর দ্বিমত নেই। এটা হচ্ছে একটা মর্যাদা ও শ্রেণী। আবার এক ব্যক্তির বিশ্বাস, সাক্ষ্যদান ও কিছু কিছু আমল সঠিক কিন্তু সে কবীরা গুনাহ অথবা কয়েকটা কবীরা গুনাহ করেছে। এক্ষেত্রে আহলি সুন্নাত ও মুতাযিলাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। মুতাযিলাদের মতে, কবীরা গুনাহ বা কতিপয় কবিরা গুনাহ্ করার ফলে সে ঈমান থেকে খারিজ হয়ে গেছে। আবার সে কুফরীর মধ্যেও প্রবেশ করেনি। বরং তাকে ফাসেক বলা হবে। সে দুটি অবস্থানের মাঝামাঝি একটি স্থানে অবস্থান করছে। তাদের মতে সে চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। অন্যদিকে আহলি সুন্নাতের মতে, সে একজন গুনাহগার মুমিন। সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না।[২০] এটা হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণী।

এক ব্যক্তির বিশ্বাস আছে এবং সে মৌখিক সাক্ষ্যদানও করেছে কিন্তু আমল করেনি। এক্ষেত্রেও বিভিন্ন মত দেখা দিয়েছে। আবু তালেব মক্কীর মতে, অংগ-প্রত্যংগের সাহায্যে আমল করাটাও ঈমানের অংশ। এছাড়া ঈমান পূর্ণ হবে না। তিনি এর ওপর ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে দাবি করেছেন। কিন্তু ইমাম গাযালী বলেন ভিন্ন কথা। বরং তাঁর মতে এ ব্যক্তির ঈমান আছে কিন্তু আমল নেই। এটি হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণী।

অন্যদিকে এক ব্যক্তি অন্তরে বিশ্বাস করলো কিন্তু কণ্ঠে তা উচ্চারণ করার বা কোনো আমল করার পূর্বে মারা গেলো। এক্ষেত্রেও বিভিন্ন মত দেখা দিয়েছে। সে মুমিন কি না? যারা ঈমানের পূর্ণতার জন্য সাক্ষ্যদানের শর্ত আরোপ করেন তাদের মতে সে মুমিন নয়। আবার যাদের মতে কেবলমাত্র অন্তরের বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঈমান অর্জিত হয় তারা বলেন সে মুমিন। এটা হলো চতুর্থ শ্রেণী।[২১]

ইতিপূর্বেকার আলোচনাগুলো গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে আমরা জানতে পারি যে, পূর্ণাংগ ইসলাম বলতে সবাই তার বাইরের ও ভেতরের উভয় দিকই বুঝিয়েছেন। এ ব্যাপারে সবাই একমত। পূর্ণাংগ ঈমানের ব্যাপারেও একই কথা। 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থের লেখক বলেন, একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, বিরোধ নিছক ঈমান শব্দটি নিয়ে। কিন্তু কামেল বা পূর্ণাংগ ঈমানের জন্য একই সাথে বিশ্বাস, সাক্ষ্যদান ও আমল তিনটিই অপরিহার্য। এ ব্যাপারে ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে।[২২]

সারকথা হচ্ছে : ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বশ্যতা, অধীনতা ও আনুগত্য স্বীকার করা। এ আভিধানিক অর্থই এর শরয়ী প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হয়েছে, এতে সন্দেহ নেই। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ্ বলেন, 'বলো আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি।'[২৩] মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, 'তারা কি চায় আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য দীন? অথচ আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে।'[২৪] ইসলাম শব্দটির বিভিন্ন ব্যবহার দেখা যায়। যেমন সমস্ত প্রত্যাদিষ্ট ধর্মকে ইসলাম বলা হয়। ঐতিহাসিক ঘটনার ওপরও ইসলাম শব্দ প্রয়োগ করা হয়। যেমন ইসলামের যুগ অথবা তার সূচনা বা প্রকাশ।

এ সমস্ত প্রয়োগের মধ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রেরিত দীনের মধ্যে এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি পরিচিত। এখানে এর ব্যবহার হয় আকীদা-বিশ্বাসের নীতি, ইবাদতের বিধানাবলী, নৈতিক শিক্ষা ও শরীয়তের অনুশাসনের ক্ষেত্রে। মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর মধ্যে একই উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে।

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণতা দান করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম। আর ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।'[২৫] এ অর্থে অন্যান্য ধর্মকে এর মোকাবিলায় দাঁড় করানো যায়। যেমন ইহুদী ধর্ম ও খৃস্টধর্ম। এর অস্বীকারকারী যেকোনো বিশ্বাসের অধিকারীই হোক না কেন তাকে কুফরীর সাথে সম্পৃক্ত করা হবে। কুফরী অর্থ হবে অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, আবরণ দেয়া ও ঢেকে ফেলা। এক্ষেত্রে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যাঁর মাধ্যমে এ দীন এসেছে, তাঁর নবুওয়াতকে বিশেষভাবে সামনে রাখা হয়েছে।

আভিধানিক অর্থে ঈমান হচ্ছে নিছক বিশ্বাস। শরীয়তের দৃষ্টিতে আন্তরিক বিশ্বাস, যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং তার অপরিহার্য ফলস্বরূপ এর আগমনের পথ বাতলে দিয়েছেন। তিনি এর আগমনের পথ বিস্তারিত আকারে যেভাবে বাতলেছেন এবং সংক্ষিপ্ত আকারে যেভাবে বাতলেছেন তা ঠিক তেমনিই। শরয়ী ও আভিধানিক অর্থের মধ্যে এক্ষেত্রে নিছক ব্যাপকতা ও বিশিষ্টতার সম্পর্ক রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারা একত্র হয় এবং নিছক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কেবল আভিধানিক অর্থই প্রযোজ্য হয়।[২৬]

শরীয়তের দৃষ্টিতে ইসলাম ও ঈমানের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, পূর্ণাংগ ইসলামের জন্য অন্তরের ও বাইরের উভয়ের সম্মিলন অপরিহার্য। ঈমানের ব্যাপারেও একই কথা। এ ব্যাপারে ইতোপূর্বে উমদাতুল কারী গ্রন্থের লেখকের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি। এর বিরুদ্ধ মতও আছে।

একদলের মতে, আমল হচ্ছে ঈমানের প্রকৃত সত্তার অংশ এবং তা তার কাঠামোর অন্তরভুক্ত। আমলের বিলুপ্তিতে ঈমানও বিলুপ্ত হয়ে যায়।

অন্য দলের মতে, আমল প্রচলিত রীতি-নীতির বিভিন্ন অংশ। কাজেই আমলের বিলুপ্তিতে ঈমানের প্রকৃত সত্তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। এগুলো ঠিক যেন করীমের হাত, পা, চুল, নখ ইত্যাদি শরীরের অংগ-প্রতংগের মতো। এগুলো না থাকলে করীম নেই একথা বলা যায় না।

তৃতীয় একদল বলেন, ঈমানের কারণে বাইরের প্রভাবে আমলের সৃষ্টি হয়। ঈমান শব্দটি তার ওপর পরোক্ষভাবে প্রযুক্ত হয়। এ ব্যাপারে কোনো বিরোধ নেই। এ ব্যাপারে শব্দটিকে তার প্রকৃত সত্তার ওপর বা পরোক্ষভাবে ব্যবহার করার দ্বিতীয় সম্ভাবনা রয়েছে। এটি একটি শাব্দিক বিতর্ক মাত্র।

অন্য একদলের মতে, আমল ঈমান থেকে সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস। একথা যারা বলেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন খারেজীদেরও কয়েকজন। তারা বলেন, গুনাহ ঈমানের ক্ষতি করে না, যেমন নেকী কুফরীকে লাভবান করে না।[২৭]

এখানে যে সমস্ত অভিমত উদ্ধৃত করা হলো তার মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিমত দুটি পূর্ণাংগ দীনের শরয়ী অর্থের সবচেয়ে নিকটতর। কারণ এ দুটি অভিমতে ঈমানকে অংশ বা কারণ হিসাবে আমলের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

কাজেই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য পূর্ণাংগ দীন হচ্ছে এমন একটি বিষয় যার মধ্যে ঈমান ও আমল উভয়ের উপস্থিতি অপরিহার্য। অন্যথায় তা পূর্ণতা ও গ্রহণযোগ্যতায় পৌঁছুতে পারবে না। কিছু আয়াতে যথার্থ ঈমান বিহীন আমলের জন্য মুনাফিকদের নিন্দা করা হয়েছে। কিছু আয়াতে সৎ আমলের সাথে সম্পৃক্ত করে ঈমানের উল্লেখ করা হয়েছে। শুধুমাত্র বিশ্বাসের সাহায্যে দীন অর্জিত হয়। কিন্তু দীনের পূর্ণতা ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে লাগাতার আমল করার ওপর। এটিই হচ্ছে দীনে কামেল বা পূর্ণাংগ দীন এবং এটিই ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র দীন।'[২৮] আল্লাহ আরো বলেন, 'কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তরভুক্ত।'[২৯]

আমলের সাথে ঈমানের সম্পর্ক স্থাপন করার ক্ষেত্রে কুরআনী পদ্ধতি আমাদের যে সঠিক পথ দেখায় তা হচ্ছে, সৎ কাজ করা ছাড়া ঈমানের কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই দুনিয়ায় সুখ ও আখেরাতে মুক্তি ঈমান ও আমলের সংযুক্তি ছাড়া সম্ভব নয়।

যদি আমরা ঈমানের সাথে আমলের সম্পর্কের তুলনা করি তাহলে আমরা বলবো, ঈমানটা হচ্ছে গাছের মূল ও শিকড়ের মতো এবং আমল তার কাণ্ড, শাখা প্রশাখা ও পত্র পল্লব।

মূলের সাথে কাণ্ডের অনিবার্য সম্পর্কের ব্যাপারে কেউ সন্দেহ পোষণ করেন না। এ সম্পর্ক অংশ বা কার্যকারণ ভিত্তিক যাই হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। গাছ বলতে কখনো মূলকে বুঝায় আবার কখনো পরোক্ষভাবে কাণ্ডকেও বুঝানো হয়। কিন্তু তাই বলে বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা যাদের আছে তারা কেউ একথা বলতে পারবেন না যে, অংশ সমগ্রের সমান বা কার্যকারণ ও কারণসূচকের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।

মূলত গাছ থেকে যদি ফল লাভ করতে হয় তাহলে মূল ও কাণ্ডকে একসাথে থেকে একত্রে কাজ করতে হবে। মূল যদি একাই কাজ করে এবং তার সাথে কাণ্ড যুক্ত না হয় বা সহযোগিতা না করে তাহলে যেমন তা ফল দিতে ব্যর্থ হবে ঠিক তেমিন কাণ্ডকে মূল থেকে আলাদা করে দিলে তার ফল দেয়া তো দূরের কথা, জীবনী শক্তিই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

গাছের মূল যেমন লোক চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত গাছের একটি অংশ এবং কাণ্ড লোক চক্ষুর সম্মুখে অবস্থিত গাছের অন্য একটি অংশ, ঠিক তেমনি ঈমান হচ্ছে দীনের একটি গোপন ও অন্তরনিহিত দিক এবং আমল তার বাইরের ও বাহ্যিক দিক।

এ বিষয়টি স্থিরীকৃত হয়ে যাবার পর এখন আমরা যদি গাছের মূল ও শিকড়কে জীবিত, সুস্থ, সবল ও নিরাপদ রাখতে চাই তাহলে আমাদের তার কাণ্ড শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লবের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। যখনই বাইরে থেকে গাছকে দেখবো সুন্দর, সবুজ ও সতেজ তখনই আমাদের মনের চোখে ভেসে উঠবে তার মূলের সুস্থতা ও নিরাপদ অবস্থা এবং আমরা বুঝতে পারবো গাছের অন্যান্য অংশগুলোতে খাদ্য ও পানি সরবরাহ করার ক্ষমতা তার বহাল আছে। কোনো গাছের মূলকে বাদ

দিয়ে তার কাণ্ড থেকে ফল লাভ করার আশা যেমন আমরা করি না তেমনি তার কাণ্ডকে বাদ দিয়ে মূল থেকেও করি না।

অনুরূপভাবে প্রকাশ্য আমল, যা মানুষের চোখে দেখা যায়, তা তার ঈমানের সুস্থতা ও সত্যতা প্রমাণ করে। সত্য ঈমান মানুষের আমলকে খাদ্য সরবরাহ ও পরিপুষ্ট করে এবং তার অন্তস্থিত নূরকে দীর্ঘায়িত করে দর্শকদেরকে আনন্দিত ও বিমোহিত করে।

আবার কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা বাতাস ও আলোক থেকে কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে তা মূলের দিকে ফিরিয়ে দেয়। এর ফলে মূলের শক্তি ও ভারসাম্য বৃদ্ধি পায়। সৎ আমলও তেমনিভাবে ঈমানের দিকে তার ফল ফিরিয়ে দেয়। যার ফলে ঈমানের শক্তি ও পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি পায়। ঈমান যদি সত্য হয় তাহলে দেহের অংগ প্রত্যংগে কর্ম প্রবাহ সৃষ্টি হয়। আর আমল ও কর্ম যদি ভাল ও সঠিক হয় তাহলে ঈমানের শক্তি ও পরিচ্ছন্নতা বেড়ে যায়। ঈমান হৃদয়ে গেঁথে যায় এবং আমল তার সত্যতা প্রমাণ করে।

এ থেকে আমরা প্রথম যুগের মুসলমানরা যারা আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমানের সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যেই তাঁদের আমল নিবেদিত করেছিলেন, তাদের সাফল্যের এবং আমাদের বর্তমান যুগ পর্যন্ত শেষ যুগের মুসলমানদের দুর্বলতা ও ব্যর্থতার রহস্য জানতে পারি। আমরা আমাদের ঈমান ও আমলকে কেবল কণ্ঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি। ফলে আমাদের ঈমানের সাহায্যে আমরা আল্লাহকে মিথ্যা সাব্যস্ত এবং আমাদের আমলকে বিপর্যস্ত করেছি। আমরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে গেছি কিন্তু আমরা প্রতারিত হয়েছি। তিনি আমাদের ভীতি ও ক্ষুধার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছেন। পৃথিবীর সর্বত্র আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন আমাদের শত্রুদের ও আমাদের দীনের শত্রুদের। তারা আমাদের ও আমাদের দীনের ওপর আঘাত হানার ব্যাপারে কোনো প্রকার ত্রুটি করছে না। আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা এবং অর্থসম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে তারা আমাদের লাঞ্ছনা ও অবমাননার চূড়ান্ত পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে।

*অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব*

***প্রমাণপঞ্জি***


১. আল কামূসুল মুহীত, ৪ খণ্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা, আল মিসবাহুল মুনীর, ৩১৫ পৃষ্ঠা, আন নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস, ২ খণ্ড, ১৪৮পৃষ্ঠা।

২. আল নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস লি ইবনিল আছীর, ২ খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা এবং তামামুল হাদীসে ফীহা 'ওয়া আমেলা লিমা বাদাল মাওত।'

৩. নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস, ২ খণ্ড, ১৪৮,১৪৯ ও ১৫০ পৃষ্ঠা।

৪. আল সিরআতু ফিল উসূল, ১ খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা, ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ দারায, কিতাব আদ দীন, ৯ পৃষ্ঠা।

৫. সূরা আলে ইমরান, ৮৫ আয়াত।
৬. সূরা আল বাকারাহ, ২৫৬ আয়াত।
৭. সূরা তওবা, ৭৩ আয়াত
৮. তাফসীর, আল কুরতুবী, ৩ খণ্ড, ২৮০-২৮১ পৃষ্ঠা।
৯. ড.মুহাম্মদ আবদুল্লাহ দারায, কিতাব আদ দীন, ৪৪ পৃষ্ঠা।
১০. সূরা আর রাআদ, ১৫ আয়াত।
১১ সূরা ইউসুফ, ১৭ আয়াত।
১২. এহ্ইয়াউ উলুমিদদীন, ১ খণ্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা এবং দায়েরাতুল মাআরিফ আল ইসলামিয়া, শায়খ মুস্তফা আবদুর রায্যাকের আলোচনা, ২ খণ্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা।
১৩. সূরা আয যারিয়াত, ৩৫-৩৬ আয়াত।
১৪. সূরা ইউসুফ, ৮৪ আয়াত।
১৫. সূরা আল হুজুরাত, ১৪ আয়াত।
১৬. এহ্ইয়াউ উলুমিদদীন, ১ খণ্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা, উমদাতুল কারী আলা শারহিল বুখারী, ১ম খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা।
১৭. ঐ
১৮. আল এহ্ইয়াউ, ১ খণ্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা, শারহুন নববী আলাল মুসলিম, ১ খণ্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা।
১৯. ইরশাদুল বারী আলা শারহিল বুখারী, ১ খণ্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা।
১৯ক. বুখারী ও মুসলিম, আল এহ্ইয়াউ, ১ খণ্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা, আল কাশশাফ, ১ খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা।
২০. আল এহ্ইয়াউ, ১ খণ্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা, আল কাশশাফ ১ খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা।
২১. আল কাশশাফ, ১ খণ্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা।
২২. উমদাতুল কারী আলা শারহিল বুখারী, ১ খণ্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা।
২৩. সূরা আলে ইমরান, ২০ আয়াত
২৪. সূরা আলে ইমরান, ৮৩ আয়াত।
২৫. সূরা আল মায়েদাহ, ৩ আয়াত।
২৬. উস্তায মুহাম্মদ মুবারক আবদুল কাদেরের আলোচনা, মওসূআহ নাসের লিল ফিকহিল ইসলামী।
২৭. আল কালামূঈর হাশিয়া, ১ খণ্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা, উমদাতুল কারী, ১ খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা, শারহুন নববী আলাল মুসলিম, ১ খণ্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা, ইরশাদুল বারী, ১ খণ্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা।
২৮. সূরা আলে ইমরান, ১৯ আয়াত।
২৯. সূরা আলে ইমরান, ৮৫ আয়াত।

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৮
বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৩, পৃষ্ঠা : ৭১-৭৫

# বছরের মাঝে বর্ধিত মালের যাকাত

মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

**বছরের মাঝে বর্ধিত মালের যাকাত**

বছরের মাঝে অর্জিত বা বর্ধিত মালের যাকাত আদায় করতে হবে কি না? আদায় করতে হলে কখন আদায় করতে হবে? এসব বিষয় সুস্পষ্টরূপে জানা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এ পর্যায়ে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

যার নিকট প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন মাল নেই, তার যাকাতযোগ্য নিসাব পরিমাণ কোন মাল অর্জিত হলে তখন থেকে এক পূর্ণ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তার ওপর যাকাত ফরয হবে এবং তার যাকাত আদায় করতে হবে।

অথবা কারো নিকট যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত নিসাবের চাইতে কম অর্থ-সম্পদ থাকে অতঃপর একই জাতীয় আরো কিছু সম্পদ অর্জিত হয়, যা একত্রে মিলে নিসাব পরিমাণ হয় তবে নিসাব পূর্ণ হওয়ার সময় থেকে পুরো এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তার ওপর যাকাত ফরয হবে।[১]

অথবা কারো নিকট যদি কোন অর্থ-সম্পদ না থাকে, অতপর নিসাবের চাইতে কম যাকাতযোগ্য কোন অর্থ-সম্পদ অর্জিত হয়, তবে তার ওপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলেও তার ওপর যাকাত ফরয হবে না। অবশ্য কারো যদি নিসাব পরিমাণ মাল অর্জিত হয়, তাহলে নিসাব পূর্ণ হওয়ার সময় থেকে পুরো এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তার ওপর যাকাত ফরয হবে।[২]

যার ওপর পূর্ব থেকে যাকাত ফরয হয়ে ... এবং সে যাকাত আদায়ও করেছে, এমন ব্যক্তি বছরের মাঝে কোন সম্পদ লাভ করলে তাকে বর্ধিত সম্পদ বলে আখ্যায়িত করা হবে। যেমন ব্যবসায়িক সম্পদের মুনাফা এবং (উন্মুক্ত বিচরণকারী) পশুর বাচ্চা। এ বর্ধিত সম্পদ মূল সম্পদের অনুগামী হবে এবং মূল সম্পদের বছরই হবে এ বর্ধিত সম্পদের বছর। কেননা মূল সম্পদের সাথে বর্ধিত সম্পদের সম্পর্ক অতি নিবিড়। বরং মূল সম্পদ থেকেই তা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি নিসাব পরিমাণ (উন্মুক্ত বিচারকারী) পশুর মালিক হয়, বছরের মাঝে এমনকি বছরের শেষ লগ্নে পশুগুলো যেসব বাচ্চা দেবে, যাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে তাদের মায়েদের বছরই হবে তাদের বছর। কাজেই বছর শেষে মায়েদের সাথে বাচ্চাগুলোকেও একত্রে যোগ করে মা ও বাচ্চা সবগুলোর যাকাত একসাথে আদায় করতে হবে। অনুরূপভাবে নিসাব পরিমাণ ব্যবসায়ী সম্পদের মালিক বছরের মাঝে ব্যবসায় যে মুনাফা অর্জন করবে– তা বছরের শেষ প্রান্তে হলেও– বছরের শেষে মূল সম্পদের সাথেই পুরো বছরের মুনাফার যাকাত একত্রে আদায় করতে হবে।

---

লেখক : প্রাবন্ধিক ও গবেষক, মুফতী, দারুল ইফতা বাংলাদেশ।

ইমাম ইবনে কুদামা বলেন, এটি সর্বসম্মত মাসআলা, এতে কারো কোন দ্বিমত আছে বলে আমার জানা নেই। কারণ এসব বর্ধিত সম্পদ মূল সম্পদের নিসাবেরই অনুগামী হবে। ফলে এটা ব্যবসায়িক মালামালের মূল্যে প্রবৃদ্ধির ন্যায় এক অবিচ্ছিন্ন প্রবৃদ্ধি।[৩]

এই মাসআলায় ইমাম মালেক র. আরো বলেন, মূল সম্পদ নিসাব পরিমাণ হোক বা নিসাব থেকে কম হোক আসল ও লাভ মিলে যদি নিসাব পরিমাণ হয় তবুও মূল সম্পদের বছর পূর্ণ হলে আসলের সাথে লাভেরও যাকাত একত্রে আদায় করতে হবে।[৪]

যে মালের যাকাত আদায় করা হয়েছে, বছরের মাঝে যদি তা বিক্রয় করা হয়, যেমন ফসলের উশর আদায় করার পর তা বিক্রয় করা হলো এ বিক্রয় লব্ধ অর্থ বর্ধিত অর্থের মধ্যে পড়লেও এর ওপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত না হলে। এর ওপর যাকাত ফরয হবে না এবং তার নিকট পূর্ব থেকে বিদ্যমান অর্থের সাথে মিলিয়ে তার সাথে দ্বিতীয় বার এর যাকাত আদায় করতে হবে না। কারণ এতে এক বছরে একই সম্পদের ওপর দুবার যাকাত আদায় করা হয়। অথচ একই সম্পদের ওপর বছরে দুবার যাকাত আদায় করা যায় না।[৫] তবে এই মাসআলায় হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট দু'জন ইমাম ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ র. এর মতে এ অর্থকে বিদ্যমান অর্থের সাথে মিলাতে হবে এবং তার সাথেই এ অর্থের যাকাত আদায় ধরতে হবে। কেননা একসাথে মিলাবার যে কারণ উভয় সম্পদ এক জাতীয় হওয়া তা এখানে বর্তমান রয়েছে।

বছরের মাঝে প্রাপ্ত সম্পদ যদি পূর্বের সম্পদ থেকে বর্ধিত না হয়ে থাকে এবং পূর্বের সম্পদের সমজাতীয়ও যদি না হয়, যেমন কোন ব্যক্তি বছরের মাঝে যে কোন সূত্র থেকে সোনা অথবা রূপা অর্জন করেছে। এ সোনা কিংবা রূপাকে এই জাতীয় সম্পদ ছাড়া অন্য জাতীয় সম্পদ যেমন ছাগলের সাথে বছরের ক্ষেত্রেও মিলানো যাবে না এবং নিসাবের বেলায়ও নয়। অর্থাৎ প্রাপ্ত সোনা বা রূপা যদি নিসাব পরিমাণ না হয় তাহলে এই জাতীয় সম্পদ ছাড়া অন্য সম্পদের সাথে মিলিয়ে নিসাব পূরণ করতে হবে না এবং সে অবস্থায় তার যাকাতও আদায় করতে হবে না। অনুরূপভাবে প্রাপ্তির পর থেকে সোনা বা রূপার ওপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত না হলে তাকে পশুর নিসাবের অনুগামী করে তার সাথে তার যাকাত আদায় করতে হবে না। অবশ্য প্রাপ্ত সম্পদ সোনা বা রূপা নিসাব পরিমাণ হলে প্রাপ্তির পর থেকে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তার ওপর যাকাত ফরয হবে, তখন তার যাকাত আদায় করতে হবে।

ইবনু আবদিল বার বলেন, এটি জমহুর অর্থাৎ হযরত আবু বকর রা. হযরত উমর রা. হযরত উসমান রা., হযরত আলী রা. এবং অধিকাংশ ইমামের অভিমত। এর বিপরীত অপ্রচলিত একটি মত রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কোন আলেম ও কোন ইমাম এ মতের ওপর ফতওয়া প্রদান করেননি।[৬]

এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নতুন কোন সম্পদ লাভ করল, তার সে সম্পদের ওপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলার নিকট তার যাকাত ফরয হয় না।'[৭]

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বছরের মাঝখানে প্রাপ্ত সম্পদ (পূর্বের সম্পদের সমজাতীয় না হলে) তার ওপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত না হলে তার যাকাত আদায় করা ফরয নয়।

এছাড়াও হযরত আলী রা.-থেকে বর্ণিত হয়েছে, বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন মালের ওপর যাকাত ফরয হয় না।[৮]
হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন মালে যাকাত ফরয হয় না।'[৯]
ইবন উমর ও আনাস রা. থেকে অনুরূপ আরো দুটি হাদীস বায়হাকী ও দারা কুতনী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এই চারটি হাদীসে সাধারণভাবে সকল সম্পদের ওপর বছর পূর্ণ হলে যাকাত ফরয না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। বছরের মাঝে বর্ধিত সম্পদও তার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বছরের মাঝে বর্ধিত সম্পদের ক্ষেত্রে এই হাদীস চারটির হুকুম প্রযোজ্য।[১০] অবশ্য এই হাদীসগুলোকে অনেকে দুর্বল বলেছেন।
ইবনে মাসউদ রা. ইবনে আব্বাস রা. ও মুআবিয়া রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, বর্ধিত সম্পদ যখন হাতে আসে তখনই তার ওপর যাকাত ফরয হয়। ইমাম আহমদ একাধিক বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা করেছেন, বর্ধিত সম্পদ যখন পাওয়া যাবে তখনই তার যাকাত আদায় করতে হবে। ইমাম আওযায়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে, কোন ব্যক্তি তার দাস অথবা বাড়ি বিক্রয় করলে তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ হাতে পাওয়া মাত্রই তার যাকাত আদায় করতে হবে। তবে কারো যাকাত আদায় করার নির্ধারিত কোন মাস থাকলে বর্ধিত সম্পদের যাকাত সে মাস পর্যন্ত বিলম্ব করতে পারবে। যাতে সে তার অন্যান্য সম্পদের সাথে বর্ধিত সম্পদেরও যাকাত আদায় করতে পারে।[১১] কারো কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে এবং বছর পূর্তির পর সে তার যাকাত আদায় করে দিয়েছে, এমন কোন ব্যক্তি বছরের মাঝে যদি একই জাতীয় আরো কিছু সম্পদ লাভ করে যা তার নিকট বিদ্যমান সম্পদের প্রবৃদ্ধি নয়, যেমন কারো নিকট সাড়ে সাত তোলা সোনা আছে, ১লা মুহাররম সে তার মালিক হয়েছে, অতপর সে ঐ বছরেরই ১লা জিলহজ্জ আরো চল্লিশ তোলা সোনা অর্জন করেছে, এ উভয় সম্পদের যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে।
ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র.-এর মতে বছরের মাঝে প্রাপ্ত সম্পদকে পূর্ববর্তী সম্পদের সাথে মিলাতে হবে নিসাব পূরণের ক্ষেত্রে, কিন্তু বছর পূর্তির ক্ষেত্রে মিলানো যাবে না। সুতরাং পূর্ববর্তী সম্পদের (সাড়ে সাত তোলা সোনার) বছর পূর্ণ হয় পহেলা মুহররাম। কাজেই পহেলা মুহররমই তার উপর যাকাত ফরয হবে। বছরের মাঝে প্রাপ্ত চল্লিশ তোলা সোনার বছর পূর্ণ হয় ঐ বছরেরই ১লা জিলহজ্জ। কাজেই ১লা জিলহজ্জই প্রাপ্ত চল্লিশ তোলা সোনার ওপর যাকাত ফরয হবে।
প্রাপ্ত সম্পদ যদি নিসাব পরিমাণ নাও হয় তবুও বছর পূর্ণ হওয়ার পর তার যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা পূর্ববর্তী সম্পদের সাথে মিলানোর কারণে তার নিসাব পূর্ণ হয়।
পূর্ববর্তী সম্পদের যাকাত আদায়ের সময় প্রাপ্ত সম্পদের বছর পূর্ণ না হওয়ার কারণে তার যাকাত আদায় করতে হবে না।
এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সম্পদের ওপর যাকাত ফরয হয় না।'[১২]
তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি বছরের মাঝে কোন সম্পদ অর্জন করে তার বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর কাছে তার ওপর যাকাত ফরয হয় না।'[১৩]

*হানাফী মাযহাব*

বছরের মাঝে প্রাপ্ত বা বর্ধিত অর্থ-সম্পদের যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে হানাফী উলামায়ে কেরামের মত হলো, প্রাপ্ত সম্পদ যদি পূর্ববর্তী সম্পদের সমজাতীয় হয়, তাহলে পূর্ববর্তী সম্পদের বছরই হবে প্রাপ্ত সম্পদের বছর। কাজেই পূর্ববর্তী সম্পদের সাথেই প্রাপ্ত সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে। যেমন ব্যবসায়িক সম্পদের মুনাফা ও পশুর বাচ্চার যাকাত আসল মাল বা মূল সম্পদের যাকাতের সাথেই আদায় করতে হয়। যেমন কোন ব্যক্তির নিকট বছরের শুরু থেকে দুই লাখ টাকা রয়েছে, বছরের মাঝে সে আরো এক লাখ টাকা অর্জন করেছে। এমতাবস্থায় পূর্ববর্তী দুই লাখ টাকার বছর পূর্ণ হলে তার সাথেই বছরের মাঝে প্রাপ্ত এক লাখ টাকার ওপরও যাকাত ফরয হয়ে যাবে। কারণ উভয় সম্পদ এক জাতীয় হওয়ার কারণে পূর্ববর্তী সম্পদের বছরকেই বছরের মাঝে প্রাপ্ত সম্পদের বছর ধরা হবে। কাজেই পূর্ববর্তী সম্পদের সাথেই বছরের মাঝে প্রাপ্ত সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে।

*হানাফী আলেমগণের যুক্তি*

**এক.** শাফেঈ ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, বছরের মাঝে প্রাপ্ত বা বর্ধিত সম্পদকে নিসাব পূরণের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সম্পদের সাথে মিলাতে হবে কিন্তু বছর পূর্তির ক্ষেত্রে মিলানো যাবে না অর্থাৎ পূর্ববর্তী সম্পদের নিসাবই হবে বর্ধিত সম্পদের নিসাব। কাজেই বর্ধিত সম্পদের নিসাব পূর্ণ না হলেও বছর পূর্তির পর তার যাকাত আদায় করতে হবে। কিন্তু পূর্ববর্তী সম্পদের বছরকে তার বছর ধরে পূর্ববর্তী সম্পদের সাথে তার যাকাত আদায় করা যাবে না। অথচ আমরা জানি, নিসাব হলো যাকাত ফরয হওয়ার কার্যকারণ, এবং বছর পূর্ণ হওয়া যাকাত ফরয হওয়ার জন্য শর্ত। কার্যকারণের বেলায় যদি পূর্ববর্তী সম্পদের সাথে বর্ধিত সম্পদকে মিলানো বৈধ হয় তাহলে শর্তের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সম্পদকে পূর্ববর্তী সম্পদের সাথে মিলানো অনায়াসেই বৈধ হবে।[১৪]

**দুই.** ব্যবসায়িক সম্পদের মুনাফা ও পশুর বাচ্চার যাকাত মূল সম্পদের সাথে আদায় করার ক্ষেত্রে ইমামগণের সর্বসম্মত অভিমত রয়েছে। ব্যবসায়িক সম্পদের মুনাফা ও পশুর বাচ্চা মূল সম্পদের সমজাতীয় হওয়ার কারণেই মূল সম্পদের বছরকে তার বছর ধরা হয়েছে এবং মূল সম্পদের সাথেই তার যাকাত আদায় করার বিধান দেয়া হয়েছে। পশুর বাচ্চা ও ব্যবসায়িক সম্পদের মুনাফা বছরে প্রতিনিয়ত ও বার বার হয়ে থাকে। প্রত্যেক বাচ্চা ও সকল মুনাফার পৃথক পৃথক সময় ও বছর হিসাব করে প্রত্যেকটির বর্ষপূর্তি অনুসারে সারা বছর অল্প অল্প করে যাকাত আদায় করতে থাকা বড় কঠিন ও নেহায়েত ঝামেলাপূর্ণ কাজ। অনুরূপভাবে বছরের মাঝে বর্ধিত সম্পদ মূল সম্পদের সমজাতীয় হওয়ার কারণে তাতে পার্থক্য করা এবং তার আমদানীর দিন তারিখ হিসাব করে করে সে মুতাবেক সারা বছর তার যাকাত আদায় করতে থাকা যথেষ্ট কঠিন ও অত্যন্ত ঝামেলা পূর্ণ কাজ। অথচ যাকাত আদায়ের বিষয়কে এসব ঝামেলা ও জটিলতা থেকে মুক্ত ও সহজতর করার জন্যই বছরের শর্ত আরোপ করা হয়েছে।[১৫]

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'দীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের ওপর কোন প্রকার সংকীর্ণতা আরোপ করেননি।'[১৬]

অতএব বছরের মাঝে বর্ধিত সম্পদ মূল সম্পদের সমজাতীয় হওয়ার কারণে তা মূল সম্পদের প্রবৃদ্ধি হোক বা ক্রয়, উপহার, সাদকা প্রভৃতি সূত্রে প্রাপ্ত হোক মূল সম্পদের বছরকেই তার বছর ধরতে হবে এবং মূল সম্পদের সাথেই তার যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা এটাই যথার্থ ও যুক্তিসংগত।[১৭]

*মালেকী মাযহাব*

এ মাসআলায় মালেকী ইমামগণ দ্বিবিধ মত গ্রহণ করেছেন। উন্মুক্ত বিচরণকারী পশুর বর্ধিত সম্পদের যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে তারা হানাফীগণের অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন অর্থাৎ বছরের মাঝে সমজাতীয় বর্ধিত সম্পদের যাকাত মূল সম্পদের সাথেই আদায় করতে হবে। কেননা পশুর যাকাত আদায় করার দায়িত্ব থাকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিয়োজিত যাকাত উসূলকারীগণের ওপর। বছরের মাঝে বর্ধিত সম্পদের যাকাত মূল সম্পদের সাথে আদায় না করলে একজন যাকাতদানকারীর নিকট তাদের বহুবার যাওয়ার প্রয়োজন হবে। এটা বড় কঠিন কাজ। আর বছরের মাঝে বর্ধিত টাকা-পয়সার যাকাত আদায় করার বিষয়ে তাঁরা শাফেঈ ও হাম্বলী ইমামগণের অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। কারণ টাকা-পয়সার যাকাত হকদারগণের নিকট পৌঁছানোর দায়িত্ব যাকাতদানকারীর নিজের ওপর। কাজেই সে নিজেই প্রয়োজন ও সময় মত তার যাকাত আদায় করবে। তাই বছরের মাঝে বর্ধিত টাকা পয়সার যাকাত মূল টাকার সাথে আদায় করতে হবে না।[১৮]

*তথ্যপঞ্জি*


১. আল মুগনী ওয়া শারহুল কবীর, ২ খণ্ড, ৪৯৬ পৃষ্ঠা।
২. আল মাউসূআহ আল ফিকহিয়্যা, ২৩ খণ্ড, ২৩ পৃষ্ঠা।
৩. আল-মুগনী ওয়া শারহুল কবীর, ২ খণ্ড, ৪৯৬ পৃষ্ঠা, আরো দ্রঃ আল মাউসূআহ আল ফিকহিয়্যাহ, ২৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০, আল ইনসাফ, ৩ খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা, আরো দেখুন বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ১ খণ্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, ২ খণ্ড, ৮৫৭-৮৫৮ পৃষ্ঠা।
৪. বিদায়াতুল মুজতাহিদ ফি নিহায়াতুল মুকতাসিদ ১ খণ্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা।
৫. ফিকহুয যাকাত, পৃষ্ঠা ২৯১, শরহে ফাতহুল কাদীর, ২ খণ্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা।
৬. আল মুগনী ওয়া শারহুল কবীর, ২ খণ্ড, ৪৯৮ পৃষ্ঠা, আরো দ্রঃ আল মাউসূআহ আল ফিকহিয়্যাহ, ২৩ খণ্ড, ৬০ পৃষ্ঠা।
৭. জামি'আত তিরমিযী, ১ খণ্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা।
৮. সুনানু আবী দাউদ, ২ খণ্ড, ১০১ পৃষ্ঠা।
৯. সুনানু ইবনু মাজাহ, ১২৮ পৃষ্ঠা।
১০. দেখুন ফিকহুয যাকাত, ২৯১-২৯৩ পৃষ্ঠা।
১১. আলমুগনী ওয়া শারহুল কবীর, ২ খণ্ড, ৪৯৬-৪৯৭ পৃষ্ঠা।
১২. সুনানু ইবনু মাজাহ, ১২৮ পৃষ্ঠা।
১৩. জামি আত-তিরমিযী, ১ খণ্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা।
১৪. আল-মুগনী ওয়া শারহুল কবীর, ২ খণ্ড, ২৯৭ পৃষ্ঠা, আরো দ্রঃ আল মাউসূআহ আল-ফিকহিয়্যাহ, ২৩ খণ্ড, ৩০-৩২ পৃষ্ঠা।
১৫. দেখুন হেদায়া, ১ খণ্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা।
১৬. সূরা আল হজ্জ ৭৮।
১৭. শরহে ফাতহুল কাদীর, ২ খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা, আরো দ্রঃ আল মাউসূ'আহ আল ফিকহিয়্যাহ, ২৩ খণ্ড, ৩০-৩২ পৃষ্ঠা, আলমুগনী ওয়া শারহুল কবীর, ২ খণ্ড, ৪৯৭-৪৯৮ পৃষ্ঠা।
১৮. আল-মাউসূআহ আল ফিকহিয়্যাহ, ২৩ খণ্ড, ৩০-৩২ পৃষ্ঠা।

*ইসলামী আইন ও বিচার*
*জানুয়ারী-মার্চ ২০০৮*
*বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৩, পৃষ্ঠা : ৭৬-৮৩*

# যৌতুক প্রথা ও ইসলাম

**নাহিদ ফেরদৌসী**

## ভূমিকা

মানুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কারণে সৃষ্টি হয়েছে পরিবার ও সমাজ। সমাজের প্রতিটি মানুষের ব্যক্তি জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল বিয়ে। বিয়ে মানব জীবনের এক পবিত্র বন্ধন। কিন্তু বাংলাদেশে নারীদের বিয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে যৌতুক প্রথা। যৌতুকের কারণে পবিত্র মধুর এই বন্ধন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এই সভ্য সমাজে যৌতুক একটি অভিশাপ, একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। যৌতুক প্রথাই সমাজে নারী নির্যাতনের পথকে প্রশস্ত ও দীর্ঘস্থায়ী করছে। অথচ আইনের কোথাও এর স্বীকৃতি নেই এবং ইসলাম ধর্মেও এর কোন স্থান নেই। ইসলামী বিধান মতে বিয়ের মধ্যে বৈধ আর্থিক লেনদেন হলো দেনমোহর, যৌতুক প্রথা ইসলামী বিধান নয়, সমাজে প্রচলিত কুরীতি। ঘৃণ্য এ কুসংস্কারটি বর্তমানে মুসলমানদের বিয়ের সাথে জড়িয়ে গেছে। মেয়ে এবং মেয়ের অভিভাবকদের জীবনে হয়ে উঠেছে অভিশাপ। যৌতুকদানে অপারগ পিতামাতা অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছেন। এভাবে নারীরা বিভিন্ন পর্যায়ে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। প্রতিবছর যৌতুকের কারণে বহু মহিলা আত্মহত্যা করছে। সরকারি ও বেসরকারিভাবে এ সম্পর্কিত নির্যাতন, হত্যার সঠিক হিসাব কেউই জানে না। কারণ শুধুমাত্র যারা রিপোর্ট করে তাদেরটাই প্রকাশিত হয়। বহু অজানা নির্যাতন থেকেই যায়।[১] অথচ বাংলাদেশে যৌতুক নিরোধ সংক্রান্ত আইন আছে। তথাপি যৌতুকের পরিণতিতে বহু অপ্রত্যাশিত অসামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হয় যা ধর্মীয় ও আইনগতভাবে নিষিদ্ধ। তাই বাস্তবসম্মত আইন প্রণয়ন করে নারীর নির্যাতনকে প্রতিহত করার সাথে সাথে ইসলামের জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হবে। তবেই মানুষের নৈতিকমানের উন্নয়ন ও যৌতুকের ভয়াবহতা থেকে সমাজ রক্ষা পাবে।

## আইনের দৃষ্টিতে যৌতুক

**সাধারণত বিয়ের সময় বরপক্ষ কনেপক্ষের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চাপ দিয়ে যে অর্থ বা সম্পদ আদায় করে তাই যৌতুক। যৌতুক বিয়ের কোন শর্ত বা উপাদান নয়।**

১৯৮০ সালের যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইনের ২ ধারায় যৌতুকের সংগা দেয়া হয়েছে এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০০৩ এর ২ (ক্র) ধারায়ও যৌতুকের অর্থ বলা হয়েছে। আইন মোতাবেক 'যৌতুক' অর্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দিতে সক্ষম হওয়া কোন সম্পত্তি বা

---

লেখিকা : সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব ল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

মূল্যবান জামানত যা একপক্ষ অন্যপক্ষকে বিয়ের আগে বা পরে বা বিয়ের সময় দেয়। যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইনে 'বর' বা 'কনে' যে কোন পক্ষ অন্য পক্ষকে যে সম্পদ দিয়েছে বা দেবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাই যৌতুক হিসেবে গণ্য হয়।[২] ২০০৩ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে যৌতুক বলতে 'বরপক্ষ কর্তৃক কন্যাপক্ষের কাছে দাবিকৃত অর্থ-সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদকেও যৌতুকের অন্তর্ভুক্ত করেছে যা ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনে ছিল না।' ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনে যৌতুক বলতে যে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানতকে বোঝানো হয়। উভয় আইনের প্রেক্ষিতে যৌতুক বলতে মূলত সম্পত্তি, জামানত ও ব্যাপক অর্থে অর্থ সামগ্রী অর্থাৎ অর্থের সাথে সম্পৃক্ত সকল জিনিসই যৌতুক।[৩] এভাবে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন যা ২০০৩ সালে সংশোধিত; ১৯৮০ সালের যৌতুকের সংগাটি বিস্তৃত করে যুগোপযোগী করেছে।

### *যৌতুক প্রথার উৎপত্তি*

সর্বপ্রথম কিভাবে বা কোথায় যৌতুক আদান প্রদান শুরু হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু ধারণা করা হয় হিন্দু সম্প্রদায় থেকে প্রধানত এ প্রথাটি সমাজে রীতিতে পরিণত হয়েছে। কারণ হিন্দু আইনে নারীদের উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তির কোন অংশ দেয়া হয় না। তবে বিয়ের সময় কন্যাপক্ষ বিপুল অংকের টাকা বা মূল্যবান দান সামগ্রী বরপক্ষকে পণ বা যৌতুক হিসাবে দিয়ে থাকে। কালের আবর্তে এই পণ প্রথা উদ্দেশ্য ও লক্ষ পরিবর্তিত হয়ে যৌতুক রূপে শুধু হিন্দু সমাজে নয়; সমাজের সকল ধর্মে সর্বস্তরে ভয়াবহরূপে নির্যাতনের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।[৪] কিন্তু মুসলমান মেয়েরা যেহেতু বাপের সম্পত্তির অংশ পায় কাজেই তাদের মধ্যে এই প্রথার প্রচলন অত্যন্ত দুঃখজনক।

### *যৌতুকের পরিণতি*

সামাজিক বাস্তবতায় আমরা দেখতে পাই- বিয়ের সময় ছেলে পক্ষ যৌতুক নিয়ে বিয়ে করলে বিয়ের পরে কারণে অকারণে আরও বেশি পাওয়ার জন্যে স্বামী ও স্বামীর আত্মীয়-স্বজন নির্যাতন করতে থাকে। এছাড়া যৌতুকের লোভে নিম্ন মধ্যবিত্ত পুরুষরা একাধিক বিয়ে করে থাকে যা সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সামান্য কারণে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে যৌতুক নিয়ে আবার বিয়ে করে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বামী কোন কিছু না বলে দিনের পর দিন স্ত্রীকে বাবার বাড়িতে থাকতে বাধ্য করে। এমনকি স্ত্রীর সম্পত্তির লোভে পুরুষরা অলস জীবন কাটায়। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের এক জরিপে দেখা গেছে, ২০০৩ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত যৌতুকের কারণে শারীরিকভাবে নির্যাতিত ৪১ জন, এসিড নিক্ষেপের শিকার ১০ জন, আত্মহত্যা করেছে ১১ জন এবং শারীরিকভাবে নির্যাতনের পর হত্যা করা হয়েছে ১০০ নারীকে। অথচ এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে মাত্র ৭০টি (সূত্র: আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ২০০৪)।
এভাবে যৌতুকের লোমহর্ষক পরিণতি পরিবার ও সমাজে চলতে থাকলে পারিবারিক সৌহার্দ্য ও সামাজিক মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যাবে। United Nations Devlopment program কর্তৃক

'System of Dowray in Bangladesh'-এর ওপর ১০ বছরের গবেষণা পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট-এ প্রকাশিত হয়েছে যে, বাংলাদেশের ৫০% বিবাহিত মহিলা যৌতুকের কারণে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।[৫] এক পত্রিকার জরিপে দেখা যায়, একমাত্র ২০০৩ সালে সমগ্র দেশে যৌতুকের কারণে নির্যাতনের শিকার হয়ে ১২৮ জন মহিলাকে নির্মম ও নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। নির্যাতন থেকে স্বেচ্ছায় মুক্তির জন্য এক বছরে ১৮ জন মহিলা আত্মহত্যা করে জাহান্নামের পথ বেছে নিয়েছে। এছাড়া যৌতুকের দাবি আদায়ে ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্ত হয়েছেন ১৪ জন। যৌতুক সংক্রান্ত নারী নির্যাতনের মামলা হয়েছে ১২৪টি। যৌতুকের কারণে হত্যা মামলা হয়েছে ১৬৬টি।[৬]

*যৌতুক নিরোধকল্পে আইনগত বিধান*

দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বপ্রথম ভারত যৌতুক সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে আইন পাস করার পদক্ষেপ নেয় যা The Dowry prohibition Act 1961. পরবর্তীতে পাকিস্তান আমলে এ সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করা হলেও তা শুধুমাত্র পশ্চিম অংশের জন্য প্রযোজ্য থাকে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে যৌতুক সমস্যা ক্রমাগত মহিলাদের প্রতি বর্বরতম নিষ্ঠুর আচরণের দিকে এগুতে থাকলে তা প্রতিরোধ কল্পে আইন প্রণীত হয়।[৭] বাংলাদেশে বর্তমানে যৌতুক নিষিদ্ধ করার জন্য যে সকল আইন আছে তা হলো :

Dowry prohibition Act 1980, Dowry prohibition (Amendment) Ordiance 1984, Nari O Shishu Nirjaton Damon Ain, 2000 Nari O Shishu Nirjaton Damon Ain (Amendment) 2003.

উল্লেখ্য, এই আইনসমূহ বাংলাদেশে বসবাসরত সকল ধর্মের মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

***১৯৮০ সালের যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন ও বাস্তবতা :*** এই আইনের ৩ ধারা মোতাবেক যৌতুক নেয়া ও দেয়া দুটোই নিষিদ্ধ এবং অপরাধ। যদি কেউ যৌতুক দেয় বা গ্রহণ করে অথবা আদান প্রদানে সহায়তা করে বা কুপ্ররোচণা দেয় এরকম সকলেই আইনে শাস্তি পাবে। যে কোনভাবে যৌতুক দাবি করুক না কেন সে সর্বাধিক ৫ বছর এবং ১ বছরের নীচে নয় মেয়াদের কারাদণ্ড বা ৫০০০ টাকা জরিমানা বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে।

এই আইনের ৪ ধারায় শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কনের অভিভাবকের কাছ থেকে যৌতুক দাবি করার জন্য দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। যদিও বাস্তবে কেউ যৌতুক দাবি করলেও সাক্ষী প্রমাণ রাখে না তাই অপরাধ প্রমাণ করা কঠিন হয়ে যায়। বিশেষ করে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলারা বেশি এসব সমস্যার সম্মুখীন হয়।[৮] সামাজিক পরিবর্তন ও সময়ের সাথে যুগোপযোগী করার জন্য যৌতুক নিষিদ্ধকরণ (সংশোধনী) অধ্যাদেশ ১৯৮৪ পাশ করা হয়। এই সংশোধনীতে যৌতুকের সংগা আরও বিস্তৃত করা হয়েছে। এই সংশোধনীতে ১৯৮০ সালের যৌতুক আইনের ৬ ধারা বাতিল করা হয়।

***নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত) ২০০৩ ও বাস্তবতা :*** নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১১ ধারার ক ও খ উপধারায় যৌতুকের শাস্তির বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে

এখানে বিয়ের পরে যৌতুকের জন্য নির্যাতনের শাস্তির বিধান বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এই আইনের মাধ্যমে যৌতুক কেন্দ্রিক নির্যাতনের প্রতিকারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

১১ ধারার ক এবং খ উপধারা অনুযায়ী যদি কোন নারীর স্বামী বা স্বামীর কোনো আত্মীয়-স্বজন যৌতুকের কারণে উক্ত নারীর–

ক. মৃত্যু ঘটান,

খ. মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন,

গ. মারাত্মক জখম করেন বা

ঘ. সাধারণ জখম করেন তবে তার শাস্তি নিম্নরূপ :

(ক) মৃত্যু ঘটানোর জন্য মৃত্যুদণ্ড এবং জরিমানা।

(খ) মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং জরিমানা।

(গ) মারাত্মক জখমের জন্য যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১২ বছর কিন্তু অন্যূন ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।

(ঘ) সাধারণ জখমের জন্য অনধিক ৩ বছর কিন্তু অন্যূন ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।[৯]

২০০০ সালের এই নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১১ ধারাটি ১৯৮৩ সালের নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশের ৬ ধারা এবং ১৯৯৫ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইনের ১০ ধারার ওপর তৈরি হয়েছে। শুধুমাত্র ২০০০ সালের এই নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে অপরাধীদের শাস্তির বিধান আরও বিস্তৃত করা হয়েছে।

এছাড়াও এই আইনের ২৫ ধারা অনুযায়ী গঠিত একটি বিশেষ ট্রাইবুনালের কথা বলা হয়েছে যেখানে নির্যাতনের বিচার পরিচালিত হবে। এই আইনে রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিচারের সুবিধাও আছে। কারণ নির্যাতনের সঠিক বিচারের ক্ষেত্রে আদালতের ভূমিকা সবার আগে।[১০]

*যৌতুক কেন্দ্রিক নারী নির্যাতনের তুলনামূলক চিত্র*

| *নির্যাতনের শিকার* | *২০০২ সাল* | *২০০৩ সাল* | *২০০৪ সাল* |
|---|---|---|---|
| যৌতুকের জন্য শারীরিক নির্যাতন | ৭৫ | ৬৫ | ৭২ |
| যৌতুকের জন্য পিটিয়ে হত্যা | ১৮২ | ৫৬ | ২২৮ |
| এসিড নিক্ষেপ করেছে | ২২ | ২ | ২ |
| অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা | ৮ | ২ | ১৩ |
| আত্মহত্যায় বাধ্য করা হয়েছে | ২৮ | ২ | ১৮ |
| যৌতুকের কারণে স্বামী পরিত্যক্ত হয়েছে | ৮ | ৪ | ৭ |
| মোট | ১৫৩ | ১২৯ | ৩৪০ |

সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, ঢাকা।

প্রাপ্ত তথ্যসমূহ যদিও যৌতুকের কারণে সংঘটিত নির্যাতনের লিখিত চিত্র তথাপি এটি সহজেই অনুমান করা যায় ২০০২ ও ২০০৩ সালের চেয়ে ২০০৪ সালে নারীরা যৌতুক সংক্রান্ত নির্যাতনের শিকার হন বেশি।

### *যৌতুক ও ইসলামী বিধান*

ইসলাম মানব জাতির জন্য একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান, যা পারিবারিক থেকে রাষ্ট্রীয় সকল বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসম্মত বিধানের প্রবর্তন করেছে এবং তা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।[১১] পবিত্র কুরআন শরীফে মহান আল্লাহ বলেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নিয়ামত তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করেছি আর তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দীন হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছি।[১২]

একমাত্র ইসলাম ধর্মেই নারী-পুরুষের সমমর্যাদা ও নেক আমলের মাধ্যমে জীবন পরিচালনার তাগিদ দেয়া হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী পুরুষের নৈতিক পবিত্রতা সংরক্ষণ।[১৩] সর্বপ্রথম ইসলাম নারী সমাজকে অতি উচ্চ আসনে সমাসীন করেছে। ইসলাম ধর্মে কখনও কনের অভিভাবকের কাছ থেকে কোন রকম অর্থ সম্পদ, দ্রব্য সামগ্রী গ্রহণের কথা বলা হয়নি। বিয়ের ব্যাপারে পণ বা যৌতুক প্রথা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। দরিদ্র বা ধনী সব পুরুষের জন্য স্ত্রীকে মোহরানা দিয়ে বিয়ে করাই ইসলামের বিধান। ইসলামের দৃষ্টিতে বর কনের মাঝে কেউ কারো চেয়ে বড় বা ছোট নয়। বর যেমন কনেকে পছন্দ করবে, কনেও তেমনি বরকে পছন্দ করবে– তারপরে মৌখিক উচ্চারিত সম্মতি দিলেই বিয়ে হবে। মোহর নির্ধারণ করে এই বিয়ের চুক্তি হবে ও তা রেজিস্ট্রি হবে। কনের পরিবারের পক্ষ থেকে যৌতুক দিয়ে বিয়ে সাব্যস্ত করা কনের যোগ্যতা ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করার শামিল। পক্ষান্তরে ইসলামের মোহর প্রথা দাম্পত্য জীবনের নিরাপত্তা। যৌতুক আসলে সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া বা অযোগ্যতা ঢেকে দেয়ার একটি অহমিকাপূর্ণ পারিবারিক প্রচেষ্টা। এভাবে ইসলাম নারীর যৌতুক ছাড়া বিয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। অথচ ইসলামী বিধান মতে বিয়ের প্রথম আর্থিক লেনদেন যা হয় তা কনের প্রাপ্য।[১৪] ইসলাম বিয়েকে দৃঢ় বন্ধনরূপে স্বীকৃতি দেয়, যার ফলে নারী-পুরুষ উভয়ে একে অপরের প্রতি কর্তব্য পালন করতে পারে, শান্তিতে বসবাস করতে পারে। ভালবাসতে পারে– আর এর মধ্য দিয়েই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকে সমুন্নত রাখতে পারে। 'নারী ও পুরুষকে জোড়রূপে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন জীবন্ত আত্মা হতে।'[১৫] তাই ইসলামী বিধানে নারী ও পুরুষের পারিবারিক জীবনে সমঅধিকার বর্তমান।[১৬] কিন্তু বর্তমানে ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুসরণ না করে হিন্দু সংস্কৃতির প্রয়োগ ঘটছে মুসলিম সমাজে। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন– 'এবং তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সন্তুষ্টচিত্তে প্রদান করবে।'[১৭] এবং আরও এরশাদ করেছেন– 'তাদেরকে (স্ত্রীদের) তাদের মোহর ন্যায়সঙ্গত ভাবে দাও।'[১৮] অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'তারা (মহিলারা) তোমাদের পোশাক স্বরূপ।'[১৯] বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অন্যান্য ধর্ম মহিলাদের মান মর্যাদা খর্ব

করেছে আর ইসলাম তাদের মান মর্যাদা সংরক্ষণ করেছে।[২০] স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে আল্লাহতাআলা প্রেম ভালবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক বানিয়ে দিয়েছেন। এবং পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন- 'আর তিনি তোমাদের মাঝে সৃষ্টি করে দিয়েছেন, প্রেম ভালবাসা, দয়া, কোমলতা।'[২১]

রসূল স. পুরুষদের এই ভাষায় অসীয়ত করেছেন : 'নারীদের সাথে উত্তম আচরণের ব্যাপারে তোমরা আমার অসীয়ত কবুল করো।'[২২]

অথচ বাস্তবে যৌতুক আদায়ের জন্য নারীদের প্রতি দৃশ্য অদৃশ্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হচ্ছে। প্রিয় নবী স. বলেন, 'তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার ঘরের লোকদের কাছে উত্তম। তোমাদের সবার চেয়ে আমি আমার ঘরের লোকদের জন্যে উত্তম।'[২৩]

ইসলাম ধর্মে পুরুষদেরকে নারীদের অধিকার সঠিকভাবে আদায় করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তাদের সাথে সুন্দর কোমল ব্যবহার করতে বলা হয়েছে : 'আর তাদের সাথে সুন্দর আন্তরিক আচরণ করো। তারা যদি তোমাদের মন মতো না হয়, তবে হতে পারে কোন জিনিস তোমাদের পছন্দ নয় অথচ তাতেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।'[২৪]

ইসলামী বিধানে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সম্পর্ক ভালো হবার ওপর নির্ভর করে পারিবারিক সুখ শান্তি, সাফল্য এবং সন্তানদের প্রশিক্ষণ ও সুন্দর ভবিষ্যত।

তাছাড়া সহিংসতাকে ইসলাম কখনও উৎসাহিত করে না। মানুষের মাঝে সদ্ভাব তৈরি ও রাখার ওপর ইসলাম বারবার তাকিদ দিয়ে আসছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- 'মুমিনগণ কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কোনো নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গুনাহ। যারা এ ধরনের কাজ থেকে তওবা করে না তারাই জালিম।'[২৬]

এ ধরনের আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে মানুষকে অপমান করা, মানসিক কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকাই মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। সমাজের যে কোন মানুষকেই যে কোন ধরনের আঘাত বা অপমান করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি নারীর ওপর হাত দিয়ে আঘাত করাও নিষিদ্ধ করেছেন রসূলুল্লাহ স.। কেননা এটা অবমাননাকর। কিন্তু আমাদের সমাজে মেয়েদের বিয়ের পর যৌতুকের কারণে শ্বশুরবাড়ির মানুষের বিমাতাসুলভ আচরণ ও নির্যাতন স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে। এমনকি নির্যাতিত হয়েও মহিলারা স্বামী সম্পর্কে নালিশ করতে সাহস পান না।

অথচ শুধুমাত্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থার জ্ঞান না থাকার কারণে এবং জ্ঞান থাকলেও এ পথ থেকে বিচ্যুত হবার কারণে মানুষ নৈতিকতাবর্জিত বিবেকহীন, অন্যায়পথে জীবন চালাচ্ছে। ফলে নিকৃষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির উগ্র কামনা-বাসনা, লোভ-লালসার আস্ফালন মানুষের মধ্যে জাগ্রত হচ্ছে। দেশে যৌতুক নিরোধ আইন থাকলেও সত্য দৃষ্টিভঙ্গি এবং নৈতিক শুদ্ধতা না থাকার কারণে নারী আজ নিগৃহীত ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। একমাত্র ইসলাম ধর্ম শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে মানুষকে বিভিন্ন বিধানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে ঈমানের মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে। পারিবারিক জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রের বিশ্বের সব কাজে কল্যাণ বয়ে আনার চেষ্টা করে।[২৭]

## উপসংহার

আমরা জানি পরিবার হচ্ছে সমাজের ভিত্তি। সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য যৌতুকের সহিংসতারোধ করতে হবে। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হিসেবে নারী পুরুষের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে আজ থেকে চৌদ্দশ বছরেরও আগে। তাই আজকের আধুনিক যুগেও ইসলামী বিধান কার্যকর করে যৌতুক বন্ধ ও নির্যাতন রোধ করা সম্ভব। দেশের পারিবারিক আইনসমূহ ইসলামী ন্যায়নীতির আলোকে সংস্কার এবং রাষ্ট্রে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যৌতুকের মতো অন্যায় দাবি প্রতিহত করা সম্ভব।[২৮]

কারণ নারী জাতির সুষ্ঠু উন্নতি ছাড়া সমাজকে সমুন্নত বলা যায় না।[২৯] সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করলে এই যৌতুক সমস্যার সমাধান হবে। এর পাশাপাশি আইনের সঠিক প্রয়োগ এবং শিক্ষার প্রসার ও আইনগত সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। তবেই সমাজ থেকে যৌতুক নামক এই সামাজিক ব্যাধি দূর হবে।

## তথ্যপঞ্জি


১. Mst. Papia Sultana 'Dowry system and its correlates' Journal of the institute of Bangladesh studies vol 29, 2006, Rajshahi University. P-129.

২. সাহিদা বেগম 'মুসলিম আইন ও পারিবারিক আদালত' বাংলা একাডেমী, ঢাকা প্রকাশ ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ৬০।

৩. DLR, 37, P-230.

৪. জোবাইদা সুলতানা 'যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি'। Rajshahi University law journal; December 2005, Faculty of law, Rajshahi University P-113.

৫. দৈনিক আজকের কাগজ, ডিসেম্বর ২৯, ২০০৬।

৬. 'অগ্রপথিক' ত্রৈমাসিক পত্রিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বর্ষ ১৯, সংখ্যা ৮, ২০০৪ সাল পৃষ্ঠা ৬৮।

৭. Dr. Taslima Monsoor, 'Dowry problem in Bangladesh : Legal and Socio-cultural perspectives, Journal of the Faculty of Law. Vol-14. No. 1 June 2003. P-6.

৮. Lucy carroll 'Recent Bangladesh Legislation Affecting women : child marriage, Dowry and cruelty to women' Islamic and comparative Law; Quarterly Vol. v; No. 3-4, September-December 1985, page-260.

৯. 'আইনের কথা' আইন কনিকা 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (২০০৩ এর সংশোধনীসহ)' আইন ও সালিশ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত; ২০০৫, পৃষ্ঠা-১৫।

১০. Muhammad D.M. Sarker 'A Review on the Nari O Shisuh Nirjajatan Daman Ain 2000.' Jatio Journal. Vol-II, May 2003, Judicial Administration training Institute, Dhaka, P-42.

১১. নাহিদ ফেরদৌসি 'নারীর পারিবারিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ইসলামের বিধান ও প্রচলিত আইন', ইসলামী আইন ও বিচার, ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৭ বর্ষ ৩, সংখ্যা ৯, ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা ৭৯।

১২. সূরা মায়েদা; আয়াত-৩।

১৩. 'দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশকাল ২০০২, পৃষ্ঠা ৪১১।

১৪. ড. হাবিবা খাতুন 'ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম' অ আ প্রকাশনী, প্রকাশকাল ২০০৪, পৃষ্ঠা ২১, ৫৪।

১৫. সূরা নিসা; আয়াত ১।

১৬. সা'দ উল্লাহ, 'শরীয়া আইন ও ইসলাম' অনন্যা প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ ২০০১, পৃষ্ঠা ৮৪।

১৭. সূরা নিসা, আয়াত ৪।

১৮. সূরা নিসা, আয়াত ২৫।

১৯. সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৭।

২০. অধ্যাপক দেওয়ান নূরুল হক 'নবী পাক স. মহিলাদের শ্রেষ্ঠ হক সংরক্ষণকারী' মাসিক মদীনা পত্রিকা, সীরাতুন্নবী স. সংখ্যা ২০০৪, পৃষ্ঠা ১২।

২১. সূরা আরাফ, আয়াত ২১।

২২. বুখারী; মুসলিম।

২৩. তিরমিযী, দারামী; ইবনে মাজাহ।

২৪. সূরা আননিসা, আয়াত ১৯।

২৫. সাইয়েদ হামেদ আলী 'ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?' অনুবাদ আবদুস শহীদ নাসিম, প্রকাশক সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী; ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৫৭।

২৬. সূরা হুজুরাত, আয়াত ১১।

২৭. ড. হাবিবা খাতুন 'ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম 'অ আ প্রকাশনী, প্রকাশকাল ২০০৪, পৃষ্ঠা ৮৬।

২৮. গাজী ওমর ফারুক ও খন্দকার এবি[illegible] উদ্দিন 'নির্যাতন ও নারীর প্রতি বৈষম্যরোধে ইসলামী বিধান' The Islamic University studies, The faculty of law and shariah. Islamic University, Kustia, Vol-2, No-2, June 2001, Page 195.

২৯. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'ইসলাম প্রসঙ্গ' প্রকাশনা মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশকাল এপ্রিল ২০০০, পৃষ্ঠা ৩১।

*ইসলামী আইন ও বিচার*
*জানুয়ারী-মার্চ ২০০৮*
*বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৩, পৃষ্ঠা : ৮৪-৮৭*

# ইসলামে পানি আইন ও বিধি বিধান

*মো. নূরুল আমিন*

॥ আট ॥

পূর্ববর্তী আলোচনায় এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রাতিষ্ঠানিকীকরণই হচ্ছে পানি আইনের আধুনিক ধারা প্রবাহের মূল লক্ষ্য এবং সামাজিক স্বার্থের ধারণা (Concept of community interest) হচ্ছে মুসলিম পানি আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও ভিত্তি। এই ভিত্তিকে সম্প্রসারণের জন্য যুগে যুগে মুসলিম শাসকরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের আমলে ইসলামের অন্যান্য আইনের পাশাপাশি পানি আইনকেও কোডিফাই করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং এর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ভূখণ্ডে ছড়িয়ে দেয়া হয়। সউদী আরবে রাজকীয় ফরমান বলে পানি আইন জারী ও কার্যকর করা হয়। এ পর্যায়ে সউদী আরবের কিছুটা পরিচয় দেয়া জরুরী বলে মনে হয়। আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ এলাকা নিয়ে এই রাজ্যটি গঠিত এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর এবং পূর্বে আরব বা পারস্য উপসাগর তারই নিয়ন্ত্রণাধীনে। দেশটির বেশির ভাগ মরুভূমি হলেও তার পশ্চিমাঞ্চলের তিহামা এলাকায় কিছু কৃষি ভূমি এবং আসির এলাকায় পাহাড় পর্বত রয়েছে। পূর্বাঞ্চলে আল হাসা এবং হিজাজ ও নজদ এলাকাতেও অনুরূপ আবাদযোগ্য জমি রয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৭৪৪ সালে রাজকীয় সউদী আরবের সূচনা হয়। বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও সংস্কারক মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব ও আল জারিয়ার আমীর যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সউদের মধ্যে সম্পাদিত এক চুক্তির ফলে এর সূত্রপাত ঘটে। কঠোরভাবে তৌহিদের নীতিমালা এবং শরিয়াহর অনুশাসন মেনে দেশ পরিচালনার লক্ষে আল সউদ পরিবারের শাসন প্রতিষ্ঠার এটা ছিল প্রথম পর্যায়। ১৮১৭ সালে মিশরীয় কমান্ডার ইব্রাহিম পাশার কাছে ইমাম আবদুল্লাহ বিন সউদের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে এই অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। ১৮২৪ সালে আমীর তুর্কী বিন আবদুল্লাহ কর্তৃক রিয়াদ দখল এবং নজদ থেকে সকল বিদেশী সৈন্য বিতাড়নের মধ্য দিয়ে এর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। তবে ১৮৯৬ সালে ইমাম আবদুর রহমান বিন ফয়সলের পরাজয় এবং রিয়াদ নগরী পরিত্যাগের মধ্য দিয়ে এই পর্যায়েরও সমাপ্তি ঘটে। আবার এর তৃতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় শুরু হয় ১৯০২ সালে যখন আমীর আবদুল আজিজ বিন আবদুর রহমান রিয়াদ পুনর্দখল করেন এবং নজদ ও হিজাজ অধিকার করে ১৯৩২ সালের ১৮ মে রাজতান্ত্রিক সউদী আরব প্রতিষ্ঠা করেন। একটি রাজকীয় ঘোষণার মাধ্যমে আবদুল আজিজ বিন আবদুর রহমান আল সউদ পরিবারের প্রথম বাদশাহ নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সালে তিনি আসির অঞ্চলকে তার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং ইয়েমেনের ইমাম ইয়াহিয়ার সাথে সম্পাদিত এক শান্তি চুক্তি অনুযায়ী জিযান অঞ্চল ও সউদী আরবের সাথে যুক্ত হয়।

---

লেখক : সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও গবেষক।

## সউদী আইন

শরিয়া হচ্ছে সউদী আরবের আইন ও বিধি বিধানের মৌলিক ভিত্তি। জনসাধারণ সুন্নী মতাবলম্বী, তাদের অধিকাংশ হাম্বলী মাজহাবকে অনুসরণ করে। প্রখ্যাত সংস্কারক ও খ্যাতনামা আলেম ও দার্শনিক ইবনে তাইমিয়া র. প্রভাব সেখানে অপরিসীম। তার শিক্ষা ও চিন্তা চেতনা এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাবের ইসলামী আন্দোলন সউদী রাজ পরিবারকে এই দেশটিতে কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক আইন কানুন প্রচলনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তওহীদ, ইবাদত, নীতি নৈতিকতা, সামাজিক আচরণ, শান্তি শৃঙ্খলা, উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই আইন যুগ যুগ ধরে তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এসেছে। দেশটি আবার আধুনিক আইনের ব্যাপারেও অন্ধ নয়, পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতি এবং সামাজিক চাহিদার আলোকে শরিয়ার মূল স্পিরিটকে অক্ষুণ্ন রেখে জনস্বার্থে আইনের সংস্কার এবং আধুনিকায়নের গুরুত্বের প্রতিও দেশটি সজাগ দৃষ্টি রাখে। অধ্যাদেশ ও ফরমানের আকারে সউদী আরবের আইন ও বিধি বিধান জারী হয় তবে রাজকীয় ডিক্রি হিসেবে ইস্যু ও অনুমোদনের পরই শুধু তা কার্যকর হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডিক্রি ও ফরমানগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

1. Royal order no 2716 of May 18,1932 establishing the Kingdom of Saudi Arabia and Proclaiming King Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Al Saud as king of Saudi Arabia.
2. Official statement of Faisal's investiture as king Man, November 5, 1904.
3. Organic statute of the state, Royal Decree of May 17, 1958.
4. Council of Minister's Regulation for the Reorganisation of the Administration, Royal Decree of October 03, 1963.
5. Formation of the Bourd of Grievences, Royal Decree of May 10, 1955.
6. Distribution of Public Land Ordinance, Royal Decree of 1968.
7. Operational Procecure of the Distribution of public land ordinace, Royal Decree of 1968.
8. Ministerial Resolution No 328 of 19 May, 1386 AH regarding the formation of a Ministerial committee to lay down a public policy for the Digging of wells for drinking water and the extension of Drinking water Networks.
9. Royal order no 17687 of Aug 19, 1391 AH Prohibiting the Digging of wells.
10. Royal order no 8949 of April 2, 1391 AH. Prohibiting the Digging of well in the city of Riyadh.
11. Royal order No 2092 of Feb 7, 1391 AH Prohibiting the Digging of wells in Medina.
12. Royal order No 7553 of April 13, 1387 AH Prohibiting the Digging of wells in Qatit.

উপরোক্ত আইনগুলো ছাড়াও সউদী সরকার ১৯৭৩ সালের আগে ও পরে পানি সংক্রান্ত বেশ কিছু আইন, অধ্যাদেশ এবং বিধিমালা প্রণয়ন করেছেন এসব আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে বর্ণনা করা হচ্ছে :

*পানির মালিকানা*

হাম্বলী মতাবলম্বীদের ধারণা অনুযায়ী পানি হচ্ছে আল্লাহর সম্পত্তি (হক্কুল্লাহ), দুনিয়ার মানুষের জন্য এটা তাঁর দান এবং এ প্রেক্ষিতে সকল মানুষ বিনা মূল্যে পানি পাবার অধিকার সংরক্ষণ করে। আরবী ভাষায় এটাকে মোবাহ বলা হয়ে থাকে। সউদী আইন অনুযায়ী পানির মালিকানা তখনই সম্ভব যখন পানির উপর ফলপ্রসূ দখল থাকে। ইহতিওয়া হিসাবে একে সংগায়িত করা হয় যার অর্থ হচ্ছে জলাশয়, পুকুর ডোবা, সিস্টার্ন বা যে কোন পাত্র (receptacle)। এগুলো ছাড়া পানির অন্য ধরনের স্বত্ব বা দখল বৈধ মালিকানা ছাড়া শুধু ব্যবহারের অধিকারই অর্পণ করে। এক্ষেত্রে স্বত্ব বিক্রির সীমিত ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের রয়েছে।

নদী বা স্রোতস্বীনী অথবা প্রবল বারিপাত ছাড়া পানি শূন্য থাকে এ ধরনের পাথুরে নদী খাতের মালিকানা সরকারের; সরকারি সম্পত্তি হিসেবে সরকার এগুলো নিয়ন্ত্রণ করেন। স্থানীয় রীতি অনুযায়ী সাধারণ মানুষ এগুলো ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু সেচ প্রকল্পে পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে সরকার যখন কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তখন বেসরকারিভাবে তার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যায় না কিংবা এমনভাবে পানি প্রত্যাহারও করা যায় না যাতে সেচের কাজে বিঘ্ন ঘটে। ওয়াদি জিযান ও আলহাসা সেচ প্রকল্প এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সউদী সরকারের সামষ্টিক পরিকল্পনায় এটা স্পষ্ট যে নগরবাসীদের আধুনিক সুযোগ সুবিধা প্রদান, শিল্প কারখানার চাহিদা পূরণ এবং কৃষি উন্নয়নের লক্ষে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের গুরুত্বকে সামনে রেখে সরকার পানি সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ উদ্দেশ্যে সাগরের পানি প্রক্রিয়াকরণ এবং ভূগর্ভস্থ পানির উন্নয়নের জন্যও সরকারিভাবে অসংখ্য প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

*পানি ব্যবহারের অধিকার বা পানি স্বত্ব*

সউদী আরবে হাম্বলী মাজহাবের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মূলত পানি সংক্রান্ত অধিকার বা স্বত্বের সংগা প্রদান করা হলেও কার্যত সউদীরা এ ব্যাপার বিদ্যমান স্থানীয় কাস্টমকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

*অধিকার অর্জনের পদ্ধতি*

ভূউপরিস্থ পানির অধিকার সাধারণত এই পানি দিয়ে যে জমিতে সেচ দেয়া হয় তার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং পানি বন্টন পদ্ধতির মাধ্যমে এই অধিকার অর্জিত হয়। এরপর জমির মালিকানা হস্তান্তর হলে তার সাথে পানি ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তরিত হয়। এ প্রেক্ষিতে উত্তরাধিকার, মালিকানা, হস্ত ান্তর অথবা ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত চুক্তির মাধ্যমে পানির অধিকার অর্জন বা হস্তান্তর হতে পারে। ওয়াকফ সম্পত্তির বেলায় ওয়াকফকৃত জমিতে পানি ব্যবহারের অধিকার চিরস্থায়ী, এই অধিকার বিক্রি বা খর্ব করা যায় না। তবে যিনি বা যারা এই জমি চাষাবাদ করেন তাদের মধ্যে কোনও পরিবর্তন হলে পানি ব্যবহারের অধিকারের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হয়।

ওয়াদিতে যে পানি প্রবাহিত হয় তার একটা অংশ ওয়াদি সন্নিহিত জমিতে ব্যবহার করা যায়। একই ভাবে সরকারি জমিতে খননকৃত কুয়া বা ঝরনার পানির একটা অংশও আশপাশ এলাকার হক। কৃত্রিম বাধ বা অন্য কোনও স্থাপনা তৈরি করে পানির গতিপথ পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রাপ্ত পানি প্রবাহে অংশীদারিত্ব শুধু তাদের যারা এ ধরনের বাঁধ বা স্থাপনা তৈরির ব্যয় নির্বাহে অংশগ্রহণ করেছেন। এখানে অধিকারের মাত্রা ব্যয়ের অনুপাতে নির্ণয় করা হয়। আর যদি সরকারি উদ্যোগে এই কাজ সম্পন্ন করা হয় তাহলে সরকারি নিয়মানুযায়ী ইনসাফের ভিত্তিতে জনগণ এই পানি ব্যবহার করতে পারেন।

### *পানি ব্যবহারের জন্য পারমিট পদ্ধতি*

ঐতিহ্যগতভাবে সউদী আরবে পানি ব্যবহারের জন্য পারমিট ইস্যুর দৃষ্টান্ত না থাকলেও বিদ্যমান পদ্ধতি অনুযায়ী অধিকাংশ এলাকায় পানি ব্যবহারের স্বত্ব লিপিবদ্ধ করা হয় এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সম্মতি অনুযায়ী তাদেরই নির্বাচিত একজন প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে পানির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। পানি ব্যবহারের অধিকার প্রত্যাহার করা যায় না এবং বিদ্যমান আইন কানুন লংঘন করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ক্ষতিপূরণ আরোপ অথবা যে পরিমাণ পানি আত্মসাৎ করা হয়েছে তার পাওনা থেকে সে পরিমাণ পানি প্রত্যাহারের মাধ্যমে এই শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে। জিযান ওয়াদি এলাকায় এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।
সওদী পানি আইন অনুযায়ী এই রাজ্যের আওতাধীন সকল ভূগর্ভস্থ ও ভূউপরিস্থ পানি জাতীয় সম্পদের আওতাভুক্ত। সকল সউদী নাগরিক যৌথভাবে এই সম্পদ ব্যবহার করার অধিকার সংরক্ষণ করেন; তবে জনস্বার্থ, বিদ্যমান অধিকারের সংরক্ষণ এবং স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান বা এ ব্যাপারে সরকার কর্তৃক গঠিত যে কোনও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত নিয়ম কানুন পালন সাপেক্ষে এই অধিকার প্রযোজ্য বলে গণ্য হয়। এই আইনে পানির মূল্য নির্ধারণ, পানির দখলচ্যুতির, (expropriation) জন্য ন্যায্য ক্ষতি পূরণ প্রদান, মূল শর্তাবলী পরিবর্তন/ পরিবর্ধন না করার শর্তে পানি ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তর প্রভৃতির ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন বা এ পদ্ধতি আধুনিকায়নের নামে এমন কিছু করা যাবে না যা ইসলামী আইনের মৌলিক নীতিমালা ও স্পিরিটকে লংঘন করবে। বলা বাহুল্য, এই নীতিমালা অনুযায়ী পানি ব্যবহারের তিনটি অগ্রাধিকার রয়েছে। প্রথম অগ্রাধিকার হচ্ছে গৃহস্থালীর ব্যবহার, দ্বিতীয় অগ্রাধিকার পশু পাখীর খাবার ও গোসল এবং সর্বশেষ অগ্রাধিকার হচ্ছে কৃষি কাজ।

### *গ্রন্থপঞ্জি*


1. Munir Ajlan, Tarik Al-bilad al-arabiya-al Saudia, Bairut.
2. Winder, Bayly, Saudi Arabia in the Nineteenth Century.
3. Ahmad Assah, Miracle of the Desert Kingdom, London 1969.
4. Shaikh al Islam, Ibne Taymiah, Al Siyasah Al Shariah ed. Mubarak, Bairut.
5. Makhtari, ANA, Land Tenure and Water Rights, report prepared by Sir William Hailcro and Partners on Irrigation Development in the Wadi Zizan, July 1972.

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৮
বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৩, পৃষ্ঠা : ৮৮-১০০

# ইসলামী দণ্ডবিধি

ড. আবদুল আযীয আমের

*মানহানি এবং অন্যান্য চারিত্রিক অপরাধ*
*প্রসঙ্গ : যেনা কযফ গালি-গালাজ*

*॥ তেরো ॥*

ইসলামী শরীয়ত যেনা ও কযফ (ব্যভিচারের প্রমাণহীন অভিযোগ) সংক্রান্ত অপরাধে নির্দিষ্ট শাস্তির বিধান করেছে। দণ্ডবিধি সম্পর্কে আলোচনার শুরুতে প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তিতে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে আমরা যেনার ঐ দিকটা সম্পর্কে আলোচনা করবো কোন কারণবশত (তথা হদ্দ কার্যকরী হওয়ার জন্য শর্তাদির কোন একটি বিদ্যমান না থাকার কারণে) শরীয়তের নির্দিষ্ট হদ্দ এর শাস্তি যেক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভবপর নয়। অথবা অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে সংশয় সন্দেহ দেখা দেয়ার ফলে হদ্দ যেখানে রহিত হয়ে যায়।

তাছাড়া এখানে আমরা 'কযফ'-এর ঐসব দিক আলোচনা করবো, যেসব ক্ষেত্রে কযফ এর হদ্দ কার্যকরী করার শর্তাদি বিদ্যমান না থাকার কারণে হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা যায় না অথবা কযফ প্রমাণের ক্ষেত্রে এমন সংশয় সন্দেহের উদ্ভব ঘটে যাতে কযফের শাস্তি রহিত হয়ে যায়।

উল্লেখিত দুই অবস্থায় এসব অপরাধ ঘটনার বিবেচনায় এই মানের অপরাধ হিসেবেই গণ্য হয়, যে অপরাধে শরীয়ত সুনির্দিষ্ট শাস্তি ঘোষণা করেছে এবং তাতে হদ্দ কার্যকরী হওয়াও বিধেয় কিন্তু অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা কিংবা অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সংশয় সন্দেহের কারণে হদ্দ প্রয়োগ করা যায় না।

উল্লেখিত দুই ধরনের অপরাধের বাইরেও এমন অপরাধও ঘটে যেগুলোতে শরীয়তের কোন নির্দিষ্ট শাস্তি নেই। তদ্রূপ এ ধরনের অনুরূপ অপরাধেও শরীয়ত কর্তৃক কোন হদ্দ ঘোষিত হয়নি। কিন্তু তাতে তাযিরী শাস্তি অবশ্যই প্রযোজ্য। কেননা কর্মকাণ্ড হিসেবে তা অবশ্যই অপরাধের পর্যায়ভুক্ত। এজন্য অবশ্য আমি আমাদের আলোচনাকে দু'ভাবে বিভক্ত করতে চাই।

প্রথম ভাগে যে ধরনের যেনায় হদ্দ নেই এবং যেনার সাথে সামঞ্জস্য থাকলেও যেসব অপরাধে শরীয়তের নির্দিষ্ট শাস্তি নেই সেগুলোর আলোচনা হবে। বস্তুত যেসব অপরাধ মানহানি এবং চারিত্রিক অধপতনের পর্যায়ে পড়ে সেগুলোও এর আওতাভুক্ত হবে। আর দ্বিতীয় ভাগে কযফ ও গালি গালাজ সম্পর্কিত অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা হবে।

১. *যে যেনায় হদ্দ নেই*

যেনার শাস্তিস্বরূপ হদ্দ কার্যকরী করার জন্যে কতিপয় শর্ত রয়েছে, যেগুলো বিদ্যমান থাকা জরুরী। শর্তাদির কোন একটি শর্ত যদি না পাওয়া যায় কিংবা পাওয়া গেলেও তাতে সংশয় সন্দেহের অবকাশ থাকে তবে হদ্দ রহিত হয়ে যায়। শর্তের মধ্যে অন্যতম শর্ত হলো, অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে কোন ধরনের সংশয় সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। যে সংশয়ের কারণে হদ্দ রহিত হয়ে যায়। যেমন যেনাকারিনী জীবিত, আর যেনার উদ্যোগটি পুরুষ কর্তৃক হয়েছে কিন্তু যেনার কর্মটি ঘটেছে নারী তথা ব্যভিচারিণী কর্তৃক (অবশ্য এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে) এমতাবস্থায় অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে সংশয় তৈরি হওয়ায় হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

অনুরূপ কেউ যদি মৃত কোন নারীর সাথে যেনা করে, অথবা ব্যভিচার হয়েছে তবে তা সম্মুখ ভাগে তথা প্রজননতন্ত্রে হয়নি পায়ু পথে হয়েছে, এমতাবস্থায় অপরাধীর উপর হদ্দ কার্যকরী হবে না। কিন্তু যেহেতু উল্লেখিত অপরাধসমূহে অপরাধীরা জড়িত এজন্য তারা তাযিরী শাস্তিযোগ্য অপরাধী বিবেচিত হবে।

এখন আমরা যে অবস্থায় সংশয়ের কারণে যেনার হদ্দ রহিত হয়ে যায় কিংবা হদ্দ প্রয়োগের শর্তাদির মধ্যে কোন শর্ত বিদ্যমান না থাকে সেইসব অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

***সংশয় সন্দেহ এবং এর প্রভাব :*** যেনার অপরাধে হদ্দ কার্যকরী হওয়ার অন্যতম জরুরী বিষয় হচ্ছে, ঘটনা ঘটানোর ক্ষেত্রে ঘটক তথা পুরুষের মধ্যে এমন কোন সংশয় বা সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারবে না, যে সংশয় বা সন্দেহ থাকলে হদ্দ রহিত হয়ে যায়। এই সংশয় অপরাধ কর্মের ক্ষেত্রে হোক কিংবা যানিয়ার (ব্যভিচারে অংশগ্রহণকারী নারী) ক্ষেত্রে হোক অথবা নারীর মালিকানা কিংবা অধিকারের ক্ষেত্রে হোক অথবা বৈবাহিক সম্পর্কের ব্যাপারে হোক।[১] উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোতে যদি কোন সংশয় থাকে তবে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে কিংবা অপরাধীকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে। কারণ সে এমন অপরাধ করেছে যাতে শরীয়ত কর্তৃক সুনির্দিষ্ট শাস্তি নেই।

১. কর্মের ক্ষেত্রে সংশয়ের উদাহরণ হলো, কেউ যদি তার তিন তালাক দেয়া স্ত্রীর ইদ্দত পালনকালে[২] অথবা এমন স্ত্রী যে স্ত্রী ধন দৌলত দিয়ে স্বামীর কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে কিংবা বায়েন তালাক হয়ে গেছে[৩] এমন স্ত্রীর সাথে সহবাস করে। অথবা এমন নারীর সাথে সহবাস করে যে নারী তার স্বামীর কাছ থেকে খুলা তালাক নিয়ে নিয়েছে।[৪]

উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গেলেও সংশ্লিষ্ট কিছু বিধান অবশিষ্ট থাকে এবং তাতে সংশয়ের অবকাশও থাকে। কিন্তু সংশয় তখনই কার্যকরী ভূমিকা রাখবে যখন অভিযুক্ত ব্যক্তি বৈধ সম্পর্ক মনে করে সহবাস করে থাকে। কারণ এখনও যেহেতু স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আইনানুগ বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণ হয়নি, তাই এমতাবস্থায় কারো সহবাস বৈধ বলে সংশয় হতে পারে। ফলে এই সংশয় হদ্দকে রহিত করে দেবে। উল্লেখিত অবস্থার প্রেক্ষিতে যেহেতু শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে কোন সুনির্দিষ্ট হদ্দ নেই তাই এই অপরাধে তাযিরী শাস্তি প্রযোজ্য হবে। কারণ তার কাজটি অবশ্যই একটি অপরাধ।

উপরের উদাহরণসমূহে যা বলা হয়েছে একই বিধান প্রযোজ্য হবে যেক্ষেত্রে অনুরূপ অপরাধ পাওয়া যাবে।

একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, এ ধরনের অপরাধে হদ্দ রহিত হওয়ার জন্য অপরাধীর কাজটিকে জায়েয মনে করে করতে হবে। কিন্তু অপরাধীর যদি এমন অনুভূতি থাকে, যে কাজটি সে করছে তা অবৈধ এবং এই অবৈধ হওয়ার স্বীকারোক্তিও অপরাধী দিয়ে থাকে, তবে হদ্দ রহিত হবে না।[৫] কারণ কাজটি হারাম হওয়ার জ্ঞান থাকা অবস্থায় অপরাধীর সংশয় দূর হয়ে গেছে।

২. মালিকানার ব্যাপারে সন্দেহের উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি ইশারা ইঙ্গিতে তার স্ত্রীকে বায়েন তালাক দিয়েছে।[৬] এ ধরনের তালাকের মধ্যে স্ত্রী সহবাস তখনও হালাল থাকার একটা সংশয় থাকে। এ ধরনের অবস্থায় অভিযুক্ত ব্যক্তির এ বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরী নয় যে কাজটি জায়েয। কর্মের সংশয় সন্দেহের মতো এক্ষেত্রেও অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে কাজটি বৈধ বিবেচিত হওয়া জরুরী নয়। যেমনটি কর্মে সংশয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

মালিকানা কিংবা অধিকারে সংশয়ের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত অপরাধী যদি স্বীকারও করে যে, কাজটি হারাম এ ব্যাপারে তার জ্ঞান ছিল তবুও এই স্বীকারোক্তিতে মালিকানা কিংবা অধিকারের মধ্যে সংশয় দূরিভূত হয়ে যায় না।[৭]

৩. আকদ, বা বিবাহ চুক্তির ব্যাপারে সংশয় সন্দেহের অবকাশ থাকলেও হদ্দ রহিত হয়ে যায়। বিবাহের আকদ দ্বারা বিবাহিত পুরুষের জন্যে সংশ্লিষ্ট নারী হালাল হওয়ার ভিত্তি রচিত হয়। দৃশ্যত যদি আকদ বিদ্যমান থাকে কিন্তু বাহ্যিক এই আকদ-এর আইনগত কোন ভিত্তি যদি না থাকে, বা অকার্যকর থাকে, তবে এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট স্বামীর জন্যে সংশ্লিষ্ট স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলনের বাহ্যিক একটা উপাদান বিদ্যমান থাকে যদিও বিবাহটি বিশুদ্ধ নয়। এ কারণে এ ধরনের সহবাসে কোন প্রকার শরয়ী বিধান কার্যকর করা যাবে না তবে বৈবাহিক অবস্থাটা তবুও বহাল থাকবে। এ কারণেই এহেন পরিস্থিতিতে কোন স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে তবে হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। কারণ যে কোন ধরনের সংশয়ের সুযোগ থাকলেই হদ্দ রহিত হয়ে যায়।

ইমাম আবু হানিফা র. ও ইমাম যুফার র. এর মতে কেউ যদি সন্দেহবশত দায়েমী মাহরাম (যাদের সাথে চিরদিনের জন্যে বিবাহ হারাম) এর সাথে সহবাস করে এবং এই সহবাস হারাম হওয়ার ব্যাপারটি তার জ্ঞাত হয়, তবুও সংশয় থাকার কারণে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। ইমাম ছাওরী র.ও এ প্রেক্ষিতে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম যুফার র. এর সাথে সহমত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য এ ধরনের অপরাধে অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে। কারণ সে একটি জঘন্য অপরাধ ঘটিয়েছে।

কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ র. ও ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন, কোন মাহরাম নারীকে যদি কোন পুরুষ বিবাহ করে এবং সে হারাম হওয়ার ব্যাপারে জ্ঞাত থাকে, তবে এই বিবাহ তার জন্যে হারাম হবে। এর পরও সে এই নারীর সাথে সহবাস করলে হদ্দ কার্যকর হবে। এই বিধান সেইসব নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা স্থায়ী মাহরামের অন্তর্ভুক্ত কিংবা যে নারী অন্যের বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ অথবা যারা মাহরামের সংগার অন্তর্ভুক্ত।[৮]

ইমাম আবু হানিফা র. এর দলিল হলো, এ ধরনের সহবাসের মধ্যে সংশয় সন্দেহ থাকে। তাই হদ্দ কার্যকর হবে না। এর আগেই আমরা বলে এসেছি, বাহ্যিক আকদ হওয়ার কারণে সহবাসের

বৈধতার উপাদান তৈরি হয়েছে যদিও বাহ্যিক আকদ দ্বারা সহবাস বৈধ হয় না। তবুও যেহেতু বাহ্যিক হলেও একটা আকদ এর অস্তিত্ব এখানে রয়েছে এটিই হদ্দ রহিত করার জন্যে যথেষ্ট বিবেচিত হবে।[৯] এ ধরনের অবস্থায় বংশধারা হারাম হওয়া, দুগ্ধপানজনিত সম্পর্ক হারাম হওয়া এবং স্পর্শজনিত হারাম হওয়ার বিষয়টিও একই রূপ হবে।[১০]

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন পুরুষ যদি মা ও কন্যাকে একই সাথে বিবাহ করে[১১] এবং তাদের সাথে সহবাসও করে বসে। কিংবা কেউ চার স্ত্রী থাকাবস্থায় পঞ্চম স্ত্রী হিসেবে কোন মহিলাকে বিবাহ করে ফেলে অথবা একই সাথে পাঁচজন মহিলাকে বিবাহ করে,[১২] অগ্নিপূজক[১৩] কিংবা পৌত্তলিক[১৪] নারীকে বিবাহ করে অথবা যে নারীর দুধপান করেছে তার আপন বোনকে বিবাহ করে। বিবাহ এক সাথে হোক বা ভিন্ন ভিন্ন হোক[১৫] কিংবা অপরের সাথে বিবাহিত নারীকে, অথবা ইদ্দত পালনরত নারীকে বিবাহ করে অথবা এ ধরনের নারীর সাথে সহবাস করে অথবা নিজের তিন তালাক দেয়া স্ত্রীর সাথে সহবাস করে[১৬] তবে সবকটি অবস্থাতেই তাকে কঠোর তাযিরী শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ইমাম মালিক র. বলেন, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম এ ব্যাপারে জ্ঞান থাকার পরও যদি মা, বোন, খালা, ফুফু, এ ধরনের কাউকে বিবাহ করে এবং তাদের সাথে সহবাসও করে বসে তবে তার উপর যেনার হদ্দ প্রযোজ্য হবে, যদি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে এই কর্ম করে থাকে।[১৭]

ইমাম শাফিয়ী র.ও বলেন, জ্ঞাতসারে এবং সজ্ঞানে কেউ যদি মাহরাম কাউকে বিবাহ করে সহবাস করে তবে তার উপর যেনার হদ্দ কার্যকর হবে। যেহেতু এই বিবাহ হারাম হওয়া সম্পর্কে সরাসরি পবিত্র কুরআনে আয়াত নাযিল হয়েছে এবং তার সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় করার কারণে সংশয়ের অবকাশও ধর্তব্য হবে না।[১৮]

হাম্বলী মতাবলম্বীগণ বলেন, বস্তুত মাহরামের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন সকলের মতেই অবৈধ। এমন কোন কথিত স্বামী যদি সহবাস করে তবে তার উপর হদ্দ এর শাস্তি কার্যকর হবে। 'আলমুগনী' এর প্রণেতা বলেন, অধিকাংশ আলেম একই মত পোষণ করেন। যেমন হাসান বসরী, যায়েদ বিন ছাবিত, জাবির ইবনে যায়েদ, ইমাম মালিক, শাফিয়ী, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ইসহাক, আবু আইউব এবং ইবনে আবু হাইছামা র. প্রমুখ। এসব মনীষীর দলীল হলো, অভিযুক্ত ব্যক্তির কর্মটি এমন জায়গায় সম্পাদিত হয়েছে, সর্বসম্মতভাবে যার সাথে সহবাস হারাম। কারণ অভিযুক্ত ব্যক্তি না এই মহিলার সাথে সহবাস করার অধিকার রাখে, না অধিকার প্রশ্নে কোন ধরনের সংশয়ের অবকাশ আছে। তাই সে নিসন্দেহে যেনা করেছে, ফলে সে হদ্দযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত। যেহেতু এই কাজটি হারাম হওয়ার ব্যাপারে সে জ্ঞাত ছিল তাই সে হদ্দ যোগ্য অপরাধী। এটির তুলনা হবে এমন সহবাসের সাথে যে নারীর সাথে কোন ধরনের বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়াই সহবাস করা হয়েছে। দৃশ্যত এক উপাদানই সহবাসকে বৈধতা দেয় বাহ্যিক দৃষ্টিতে যে সম্পর্ক বিশুদ্ধ মনে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে বাহ্যিক ভাবেও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম ও নিষিদ্ধ সেই সাথে অভিযুক্তের এই কর্মটি একটি জঘন্য অপরাধ হওয়া ছাড়াও অবশ্য দণ্ডযোগ্য অপরাধ। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে হদ্দ রহিত হয়ে যাওয়ার কোন উপাদান যোগ হতে পারে না।[১৯]

৪. হদ্দযোগ্য যেনার শর্তাবলীর অন্যতম একটি হচ্ছে, ধর্ষিতা বা যেনার শিকার নারী জীবিত হওয়া। মৃত নারীর সাথে যেনা করলে হদ্দ কার্যকর হবে না। মৃতের সাথে অপকর্মকে যেনা বলা যাবে না। কারণ তখন কাজটি মৃতের প্রতি অসম্মানের পর্যায়ে পড়বে এবং সুস্থ স্বাভাবিক কোন মানুষ কোন মৃতের সাথে যেনায় প্রবৃত্ত হতে পারে না। কেননা মৃত মানুষের প্রতি স্বভাবতই কেউ যৌন আকর্ষণ অনুভব করে না। এমন ঘটনায় কোন বিধিবদ্ধ শাস্তি ঘোষণার প্রয়োজন অনুভব করেনি শরীয়ত। কিন্তু তারপরও যদি কোন নরাধম এমন কাণ্ড করে বসে তবে শরীয়তে সুনির্দিষ্ট শাস্তি না থাকার কারণে অভিযুক্তকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে।[২০]

৫. সঙ্গমের ঘটনা যদি কোন পুরুষের পক্ষ থেকে না হয়ে কোন নারী বা কোন জীবের দ্বারায় ঘটে অথবা কর্মটি নারী প্রজননতন্ত্রে না হয়ে পায়ু পথে হয়ে থাকে, তাহলে এ ধরনের সব ঘটনাই নারীর পায়ু পথে রতিক্রিয়ার সাথে তুলনীয় হবে, অথবা কোন পুরুষের সাথে (লাওয়াতাত) সমকাম, কিংবা কোন জীব জন্তুর সাথে রতিক্রিয়া কিংবা শিশুর সাথে রতিক্রিয়া ইত্যাদির পর্যায়ভুক্ত হবে। এ পর্যায়ে আমরা এ ধরনের প্রত্যেকটি অবস্থা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করবো।

*যেনা যদি পুরুষের দ্বারা সংঘটিত না হয়*

যেনার অপরাধে হদ্দ এর দণ্ড কার্যকরী করতে হলে এর শর্ত হলো কর্মটি পুরুষ কর্তৃক সংঘটিত হতে হবে। যদি এমনটি না হয়ে থাকে তবে সেটিকে যেনা বলা হবে না এবং অভিযুক্তকে হদ্দের শাস্তি দেয়া যাবে না।

***এক.*** যেমন কোন নারী যদি বানরের সাথে রতিক্রিয়া করে তবে তার উপর হদ্দ কার্যকর হবে না। কারণ এই কর্মটি যেনা বা ব্যভিচারের সংগায় পড়ে না। তবে এটি নিসন্দেহে একটি অপরাধ। এমন অপরাধ যে অপরাধে শরীয়তের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট কোন শাস্তি ঘোষিত হয়নি। তাই এক্ষেত্রে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে।[২১]

***দুই.*** কোন নারী যদি অন্য কোন নারীর সাথে যৌন ক্রিয়া করে যাকে ইংরেজিতে (Lesbinnism) বলা হয় তবে এটিকে যেনা বলা হবে না। এজন্য হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। এই অপরাধে অভিযুক্তকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে।[২২]

*যেনা যদি নারীর যোনী পথে না হয়*

যেনার হদ্দ কার্যকরী করার জন্যে নারীর যোনীপথে রতিক্রিয়া হওয়াটা শর্ত। কিন্তু রতিক্রিয়া যদি নারীর পায়ুপথে করা হয়, কিংবা কোন পুরুষের সাথে করা হয় তবে ইমাম আবু হানিফার র. মতে এ কাজ যেনার সংগায় পড়ে না। এটি অবশ্যই তাযিরী শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ র. উভয় অবস্থাকেই যেনার অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। তাদের মতে এ ধরনের অপরাধে অপরাধী যদি বিবাহিত হয় তবে (রজম) প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড এবং অবিবাহিত হলে একশ বেত্রাঘাতের দণ্ড প্রযোজ্য হবে।[২৩]

ইমাম মালিক র. এর মতেও তাতে যেনার হদ্দ কার্যকরী হবে। কারণ তিনি একাজকে যেনা মনে করেন। বিখ্যাত ফিকহের কিতাব 'মুদাওয়ানাতুল কুবরায়' বর্ণিত হয়েছে, যদি কোন নাবালেগের

সাথে যেনার অপরাধ হয়ে থাকে তবে বালিগ ব্যক্তিকে রজম করা হবে। উভয়েই যদি বালেগ হয় তবে উভয়কেই রজম করা হবে, তারা উভয়েই বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক।[২৪]

ইমাম শাফিয়ী র. বলেন, সমকামীতাও যেনার পর্যায়ভুক্ত। এ কাজে জড়িতদের কেউ যদি অবিবাহিত হয় তাহলে একশ বেত্রাঘাত এবং বিবাহিত হলে রজম করা হবে। কারো কারো মতে, ইমাম শাফিয়ী এক্ষেত্রে বিবাহিত অবিবাহিতদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করেন না, উভয়কেই মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির রায় দিয়েছেন।[২৫] ইমাম শাফিয়ী র. এর থেকে অন্য একটি বর্ণনা এমনও রয়েছে যে, এ ধরনের অপরাধে যেনার হদ্দ প্রযোজ্য যেমনটি ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ বলেন এবং ইমাম শাফিয়ী র. এরও এটি বহুল প্রচারিত বক্তব্য।[২৬]

উল্লেখিত দণ্ড এমন অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যদি রতিক্রিয়া পুরুষে পুরুষে, কিংবা নারীতে নারীতে অথবা কোন পরনারীর পায়ুপথে হয়ে থাকে। কিন্তু এ কর্ম যদি কেউ নিজ স্ত্রীর সাথে করে তবে সকল ফকীহ একমত যে স্বামীর উপর হদ্দ প্রয়োগ হবে না, তাযিরী শাস্তি সাব্যস্ত হবে। কারণ স্বামী এমন অপরাধ করেছে যাতে কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান নেই।[২৭]

(নিবন্ধকার বলেন) আমার মতে উল্লেখিত সকল অপরাধের ক্ষেত্রেই তাযিরী শাস্তি প্রযোজ্য হবে। কারণ এগুলো যেনার পর্যায়ভুক্ত নয়। যেনা হলো, কোন পুরুষ কর্তৃক পরনারীর সাথে যোনী পথে রতিক্রিয়া সম্পন্ন করা। বস্তুত উপরে উল্লেখিত সকল অবস্থাতেই তাযিরী শাস্তি প্রযোজ্য।

এমন ধরনের দুষ্কর্ম যদি কেউ কোন জীবজন্তুর সঙ্গে করে তবে তার উপরও হদ্দ কার্যকর হবে না। কারণ একর্মটি যেনার সংগায় পড়ে না। হানাফী ফকীহগণের মতে এমন লোককে তাযিরী শাস্তি দিতে হবে। কারণ ঘটে যাওয়া কর্মটির ব্যাপারে শরীয়ত নির্দিষ্ট কোন শাস্তি ঘোষণা করেনি।[২৮] ইমাম মালিক র. এ মতই ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. থেকে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। শরহুল কবীর গ্রন্থে এ মতের পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ বলা হয়েছে, এ ধরনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সহীহ কোন হাদীস নেই। এ কাজটিকে কোন মানুষের সাথে কৃত যৌনাচারের সাথে তুলনা করা যায় না। কারণ একজন মানুষের যে মর্যাদা রয়েছে কোন জীব জন্তুর এই মর্যাদা নেই। তাছাড়া সাধারণত মানুষের রুচি এটিকে ঘৃণা করে। যে কোন সুস্থ মানুষের কাছে এটি ঘৃণ্য কাজ। ফলে এ ধরনের কাজে হদ্দ এর মতো কঠোর শাস্তি প্রয়োগের কোন প্রয়োজন নেই। মূলনীতি হিসেবেই এটিতে কোন হদ্দ নেই এমন পর্যায়ে এটিকে রাখা উচিত। রসূলুল্লাহ স. এর বর্ণিত হাদীস, 'কেউ যদি কোন জীবজন্তুর সাথে যৌনকর্ম করে তবে সেই ব্যক্তি ও জানোয়ার উভয়কে হত্যা করে ফেলো।'

এ হাদীসটি শুধু আমর ইবনে আবু আমর বর্ণনা করেছেন। তিনি ছাড়া আর কেউ এর সমর্থনে কোন হাদীস বর্ণনা করেননি। আমর ইবনে আবু আমর সম্পর্কে ইমাম তাহাবী র. বলেন, আমর খুব দুর্বল রাবী। তিনি ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, অথচ ইবনে আব্বাসের অবস্থান এর বিপক্ষে। ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, আমর থেকে বর্ণিত হাদীস যঈফ বা দুর্বল।

ইমাম আহমদ র.-কে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, কেউ যদি কোন জীব জন্তুর সাথে সঙ্গম করে তখন কি শাস্তি হবে? ইমাম আহমদ তখন দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকেন কিন্তু এই হাদীসটি তিনি উদ্ধৃত করেননি। যেহেতু যে কোন ধরনের সংশয়ের অবকাশে হদ্দ রহিত হয়ে যায়, তাই এমন যঈফ

হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে হদ্দ প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু হদ্দ কার্যকরী না হওয়াটা তাযিরী শাস্তিকে নিষেধ করে না। বরং এমন জঘন্য কর্মের জন্য অভিযুক্তকে তাযিরী শাস্তি প্রদান খুবই যৌক্তিক।[২৯]

*নাবালেগ ও নাবালেগার বিধান*

ইমাম মালিক র. বলেন, কোন নারী যদি এমন কোন বালকের সাথে যেনা করে যে বালকের তখনো স্বপ্নদোষ হয়নি কিংবা বীর্যপাত ঘটেনি বটে কিন্তু বালকের সঙ্গম করার মতো সক্ষমতা আছে, তবে সেই নারীর উপর যেনার হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। কারণ ইমাম মালিক র. এর দৃষ্টিতে এ কাজ যেনার সংগায় পড়ে না। যেহেতু কাজটি হারাম এজন্য তার উপর তাযিরী শাস্তি কার্যকর হবে।[৩০]

আলমুগুনী কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, নাবালেগা বালিকা যদি যেনা করার উপযোগী হয় তবে তার উপর যেনার শাস্তি কার্যকর হবে। কিন্তু যদি বালিকা সঙ্গমের উপযুক্ত না হয় তদুপরি কেউ তার সাথে সঙ্গম করে তবুও সঙ্গমকারীর উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে, কারণ সঙ্গমকারী একজন নারীর সম্ভ্রম হানি ঘটিয়েছে। এটি একজন পূর্ণ বয়স্কা নারীর সাথে যেনার মতোই অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। এমন বর্ণনাও কোন কোন ফকীহ থেকে রয়েছে যে, নাবালেগা বালিকার সাথে কৃত সঙ্গমে হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। কারণ এটি খুবই কম ঘটে থাকে এবং বিষয়টি না হওয়ার মতোই। আর যে ক্ষেত্রে এ কাণ্ডটি ঘটেছে ক্ষেত্রটি যেনার কাজে আকৃষ্ট হওয়ার মতো নয়। কাজেই এমন কর্মে হদ্দ প্রয়োগের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

এমন একটি বর্ণনাও রয়েছে, বালিকার বয়স যদি নয় বছরের কম হয় তবে তাতে হদ্দ নেই, কারণ এমন শিশুর প্রতি যৌন আকর্ষণই হয় না। অনুরূপ কোন দশ বছরের কম বয়স্ক বালকের সাথে যদি কোন পূর্ণবয়স্কা নারী সঙ্গম করে তবে তাতেও হদ্দ প্রযোজ্য হবে না।

উল্লেখিত বক্তব্যগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে আলমুগনীর প্রণেতা বলেন, যেক্ষেত্রে সঙ্গম সম্ভব সে ক্ষেত্রে যে 'মুকাল্লাফ বিশ শরীআহ' অর্থাৎ যে পূর্ণবয়স্ক তার উপর হদ্দ প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে নয় বা দশ বছরের সীমারেখা টেনে দেয়া মোটেই বাঞ্ছিত নয়।

শরীয়তের পক্ষ থেকে যদি কোন সীমারেখার কথা উল্লেখ থাকে, সেক্ষেত্রে বয়সের সীমারেখা টেনে দেয়ার সুযোগ থাকে, এক্ষেত্রে শরীয়ত কোন বয়সের সীমা বলেনি। বলা হয় নয় বছর বয়সে একজন সুস্থ মানুষ সঙ্গমের স্বাদ অনুভব করতে শুরু করে, এ বিষয়টি এমন নয় যে, এর আগে কেউ তা অনুভব করতে পারবে না। যেমন বলা হয়ে থাকে, পনেরো বছর বয়সে একজন কিশোর বালেগ হয় কিন্তু এ কথা কোন সীমারেখা টেনে দেয়নি যে, পনেরো বছরের আগে কোন কিশোর বালেগ হতে পারবে না।[৩১]

২. *অশ্লীলতা ও বেহায়াপনামূলক অপরাধ*

যেনার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের যে সকল অপরাধে নির্দিষ্ট কোন শাস্তি শরীয়তে নেই, সেগুলোও ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে অপরাধের পর্যায়ভুক্ত। এগুলোতে অপরাধীকে তাযিরী শাস্তি ভোগ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন নারী যদি যৌনাঙ্গ বাদ দিয়ে অন্য কোন ভাবে রতিক্রিয়া করে যেমন পেট উরুসন্ধি ইত্যাদি এটি এমন অপরাধ যাতে সুনির্দিষ্ট কোন শাস্তি নেই, তাই তাযিরী শাস্তি কার্যকর হবে।[৩২]

এমনও হতে পারে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন পরনারীর সাথে সঙ্গমের প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড করেছে, যেমন মর্ষকাম, চুম্বন, মর্দন লেহন ইত্যাদি বস্তুত সঙ্গম ছাড়া আর সবকিছুই সে করেছে, তবে এই অপরাধে তাকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে।[৩৩] অনুরূপ কোন পরনারীকে স্পর্শ করা, চুমু দেয়া, আলিঙ্গন করা ইত্যাদিতেও তাকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে।[৩৪]

এ ধরনের কর্মকাণ্ড অপরাধের পর্যায়ভুক্ত কারণ এতে অভিযুক্ত ব্যক্তি পরনারীর গোপন অঙ্গে হস্তক্ষেপ করেছে। এক্ষেত্রে কারো এই আপত্তি করার অবকাশ নেই যে, কেউ যদি কোন পরনারীর মুখে চুমু দেয় তাহলে তা অপরাধ বিবেচিত হওয়া উচিত নয়, কারণ চেহারা বা মুখমণ্ডল সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। বিশেষ করে আক্রান্ত নারী যখন তার চেহারা খোলা রেখে চলে এবং চেহারায় চুমু দেয়াটাকে সে অপমানকর ও অমর্যাদাজনক মনে না করে। কোন মহিলা বা নারী যদি তার কোন অঙ্গকে সতর জ্ঞান না করে উন্মুক্ত রাখে তখন কেউ তাতে চুমু দিলে অপরাধ হবে কেন?

এর জবাব হলো, জমহুরে উলামার নিকট চেহারা সতরের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই কিছু বা কতিপয় লোকের বিভ্রান্তি বা বিকৃত রুচির কারণে একটি নিষিদ্ধ বিষয় বৈধতা পেতে পারে না। উল্লেখিত কাজগুলো যদি কোন নারী করে তবে সর্বসম্মত ভাবেই সেগুলো অশ্লীলতা এবং মুসলিম নারীর জন্যে অবমাননাকর। তাই যে কোন নারীর চেহারায় চুমু খাওয়া মানহানীর পর্যায়ভুক্ত বিবেচিত হবে।[৩৫]

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, উল্লেখিত অপরাধসমূহের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মানুষের তৈরি পাশ্চাত্যের আধুনিক আইন এবং শরীআহ আইনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী শরীয়ত অপরাধ বিবেচিত হওয়ার জন্য এ ধরনের কর্মকাণ্ড জোরপূর্বক কিংবা ভয়ভীতির মাধ্যমে হওয়ার জরুরী বিবেচনা করে না। ইসলামী শরীয়ত বলপ্রয়োগ ও ভয়ভীতিকে অপরাধের মূল ভিত্তি মনে করে না, কারণ এ ধরনের আচরণ শুধু আক্রান্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে হয় না বরং গোটা সমাজ ব্যবস্থাকেই কলুষিত করে। অথচ আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নৈতিক ও চারিত্রিক অপরাধের ক্ষেত্রে জোরপূর্বক, বলপ্রয়োগ কিংবা ভয়ভীতিকে অপরাধের মূল উপাদান মনে করা হয়। অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক/বালিকা হয় তবে ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করা হয়।[৩৬]

### *অশ্লীলতা ও বেলেল্লাপনা*

অপরাধের পর্যায় যদি এমন হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কর্মটি করেছে তা উপরে উল্লেখিত অপরাধগুলোর পর্যায়ে পড়ে না, যা আক্রান্ত ব্যক্তির সতর পর্যন্ত পৌছে এবং আক্রান্ত ব্যক্তির জন্যে যা অপমানজনক। কিন্তু এখন আমরা আলোচনা করছি এমন কর্মকাণ্ড নিয়ে যা লজ্জাকর এবং শিষ্টাচার পরিপন্থী, যা দেখে বা শুনে মানুষ লজ্জা পায় কিংবা শুনতে বিব্রতবোধ করে তবে কর্মটি নোংরা অশ্লীলতার পর্যায়ে পড়ে না এবং এটি মানুষের জন্যে অপমানজনকও নয়, 'আধুনিক আইনে যাকে বিব্রতকর' বলে অভিহিত করা হয়। এটিও এক প্রকার অপরাধ এবং এই অপরাধে শরীয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট কোন শাস্তি ঘোষিত হয়নি। তাই ইসলামী আইনে এ ধরনের অপরাধে তাযিরী শাস্তি সাব্যস্ত হবে। অপরাধী এ অপরাধ প্রকাশ্যে করুক বা গোপনে করুক। যেমন, কেউ যদি কারো

সামনে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে যায় তবে এটা দর্শকের জন্যে চরম বিব্রতকর কিন্তু শরীয়তে এর জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি নেই। এ কাজটি নিসন্দেহে শালীনতা ও শিষ্টাচার পরিপন্থী, তাই অভিযুক্ত ব্যক্তি তাযিরী শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।[৩৭]

মিসরীয় আইন এ ধরনের অপরাধে শাস্তি দানের জন্যে কর্মটি প্রকাশ্যে সম্পাদিত হওয়াকে জরুরী মনে করে। অবশ্য কোন নারীকে উদ্দেশ্য করে যদি গোপনেও কোন পুরুষ এ কাজ করে তবে সেও শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে।[৩৮]

### *চরিত্রহননমূলক কর্মকাণ্ড*

যেসব কাজ চরিত্রহননমূলক ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে সেগুলো অপরাধ। যেহেতু চরিত্রহননমূলক কাজে শরীয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট কোন শাস্তি নেই তাই এগুলোতে তাযিরী শাস্তি সাব্যস্ত হবে। যেমন, কোন লোক যদি নাবালেগা কোন মেয়েকে অপহরণ করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়, এই অপরাধে তাকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে। কারণ এই অপরাধে ইসলামী আইনে সুনির্দিষ্ট কোন শাস্তি নেই। তবে অপহরণ করার পর অপহরণকারী যদি তার সাথে এমন কোন অপরাধ করে যে অপরাধের সুনির্দিষ্ট শাস্তি রয়েছে, তবে অপহরণকারীকে সেই শাস্তি দেয়া হবে।[৩৯]

কেউ যদি কোন বিবাহিতা মহিলাকে তার স্বামীর ঘর কিংবা অবিবাহিতা মেয়েকে তার বাবার ঘর থেকে অপহরণ করে অন্য কারো কাছে বিয়ে দিয়ে দেয়, এক্ষেত্রেও অপহরণকারীর তাযিরী শাস্তি হবে। কারণ এক্ষেত্রেও শরীয়তের নির্দিষ্ট শাস্তি নেই।[৪০]

কোন লোক যদি পরনারীর ঘরে তার সম্মতিতে যায় তাকেও তাযিরী শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ কাজ যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি বারবার করে তবে তাকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে। সেই সাথে সেই নারীকেও কঠোর শাস্তি দিতে হবে যে পরপুরুষকে তার ঘরে আসার অনুমতি দিয়েছে।[৪১]

### *হস্ত মৈথুন*

হস্তমৈথুন একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যেহেতু শরীয়ত কর্তৃক এতে কোন শাস্তি নির্ধারিত নেই এজন্য এই অপরাধে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে।[৪২]

স্মতর্ব, কাশশাফ আল'কিনা-এর লেখক লিখেছেন, হস্তমৈথুন অত্যধিক প্রয়োজনে জায়েয। কাজেই এ কাজের জন্য তাযিরী শাস্তি ওয়াজিব হবে না। অবশ্য যদি অত্যধিক প্রয়োজন না হয় তবে এটি অবশ্যই হারাম এবং এ ধরনের কর্মের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে। কারণ, অত্যধিক প্রয়োজন ছাড়া এ কাজ একটি নৈতিক বিকৃতি, এজন্য তাকে শাস্তি দেয়া হবে। কেননা, পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'যারা তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে'। কাশশাফুল 'কিনা' কিতাবে লিখা হয়েছে, হস্তমৈথুন নারী দ্বারা ঘটলেও একই অপরাধ। কারণ অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত রুচির নারীরাও পুরুষাঙ্গের ন্যায় বিভিন্ন বস্তু ব্যবহার করে। কোন স্বামী যদি স্ত্রীকে দিয়ে নিম্নাঙ্গের পশম অপসারণ করায় তবে সেটি নাজায়েয হবে না। এটি স্ত্রীকে চুমু দেয়ার পর্যায়ভুক্ত বিবেচিত হবে।[৪৩]

তথ্যপঞ্জি

১. সংশয় ও সন্দেহের সংগা ও প্রকারভেদ সম্পর্কে এই রচনা শুরুতে বলা হয়েছে।

২. শরহে আল কানয, আইনী খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ২২৫/২২৬। তাতে লেখা হয়েছে, কর্মের সংশয়ের মধ্যে কোন সীমারেখা নেই। যেমন তিন তালাক প্রাপ্ত নারীর ইদ্দতে সীমারেখা রয়েছে। তিন তালাক প্রাপ্তা নারীর ইদ্দতকালীন সময়ে তার থাকার জায়গা, পানাহার তথা নাফকা, ঘরের বাইরে যাওয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা, তার ঔরসজাত সন্তানের বংশ পরিচয় নির্ধারণের ফয়সালা, ইদ্দতকালীন সময়ে তালাকপ্রাপ্তার বোনের সাথে তালাকদাতা স্বামীর বিয়েতে নিষেধাজ্ঞা এবং ইদ্দতপালনকারী স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একজন অপরজনের পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি বস্তুত সংশয়ের অবকাশ এখানে রয়েই গেছে। এমতাবস্থায় যদি কোন স্বামী ইদ্দতপালনকারী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করাকে জায়েয মনে করে তবে তাতে সংশয়ের সৃষ্টি হয়, যেহেতু এতে সংশয়ের অবকাশ আছে তাই অভিযুক্তকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে। সূত্র, আসসুরাখসী, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৮৮, আলমুদাওয়ানাতুল কুবরা খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা ৫৮।

৩. শরহে ফাতহুল উযব, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৭২, প্রথম সংস্করণ, মাতবায়া আমিরীয়া, বুলাক, মিসর, ১৩১৬ হিজরী।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. শরহে ফাতহুল কাদির, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৪৬। তাতে বর্ণিত হয়েছে, এ ধরনের ঘটনায় হদ্দ প্রযোজ্য নয়, যদি না এ কর্মের কর্তা ব্যক্তিটি এ কাজকে হালাল মনে করে। যদি কর্তা জানে যে, এই মহিলার সাথে আমার সঙ্গম করা সম্পূর্ণ হারাম, তদুপরি সঙ্গম করে, তবে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। সংশ্লিষ্ট দু'জনের একজন যদি দাবি করে, সে মনে করেছিল তাদের মধ্যে এ কাজ হালাল কিন্তু অপর জন তা অস্বীকার করে তবে এদের উপর হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। সংশ্লিষ্ট উভয়েই যদি দাবী বা স্বীকার করে তাদের মধ্যে সঙ্গম হারাম তা আগেই তারা জানতো তবে হদ্দ ওয়াজিব হবে। কিন্তু তাদের কারো একজনের মধ্যে সংশয় কাজ করলে তা তার প্রতিপক্ষকেও প্রভাবিত করবে। সূত্র, আলবাদায়ে আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৭।

৬. শরহে ফাতহুল কাদির, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৪৬। তাতে বর্ণিত হয়েছে, ক্ষেত্রে সংশয় বা শুবহিফিল মহলের উদাহরণ হলো, 'কেউ যদি স্ত্রীকে ইঙ্গিত বা ইশারায় তালাক দিয়ে থাকে এবং তার সাথে পরবর্তীতে সঙ্গম করে।'

৭. শরহে ফাতহুল কাদীর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৪৬, তাতে লেখা হয়েছে, এমতাবস্থায় হদ্দ ওয়াজিব নয়। যদিও সে বলে, 'এই মহিলা যে আমার জন্য হারাম এ বিষয়টি আমার জানা ছিল।'

৮. মাবসূত, আসসুরাখসী, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৮৫-৮৭। তাতে বর্ণিত হয়েছে, কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিয়ে করল। কিন্তু সেই মহিলা সেইসব নারীদের অন্তর্ভুক্ত যাদের বিয়ে করা এই ব্যক্তির জন্যে হারাম। বিয়ের পর সে যদি এই মহিলার সাথে সঙ্গম করেও থাকে তবুও তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। এই মহিলা তার জন্যে হারাম এ বিষয়টি তার জানা থাকুক বা না থাকুক। ইমাম আবু হানিফার র. বক্তব্য এটি। উক্ত মহিলার সাথে তার বিয়ে হারাম এ বিষয়টি জ্ঞাত থাকার পরও বিয়ে করার অপরাধে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে। ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন, বিয়ে হারাম হওয়ার বিষয়টি জ্ঞাত থাকার পরও বিয়ে করলে তার উপর হদ্দ প্রযোজ্য হবে। কারণ সকল হারাম মহিলা তথা অন্যের বিবাহিত স্ত্রী এবং স্থায়ী মুহাররামাতের ক্ষেত্রেও একই বিধান কার্যকর হবে।
সূত্র, শরহে ফাতহুল কাদির, ইবনে হুমাম খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৪৭। তাতে বর্ণিত হয়েছে, বংশানুক্রমে যেসব নারী হারাম, কেউ যদি তেমন কোন নারীকে বিবাহ করে, যেমন মা, কন্যা তাহলে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম যুফার র. এর মতে তাতে হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। যদিও হারাম হওয়ার বিষয়টি তার জানা থাকে। বিয়ের কারণে তাকে মোহরানা পরিশোধ করতে হবে এবং তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এই শাস্তি তাকে তাযিরী ও অনৈতিকতার জন্যে দেয়া হবে। শরীয়তের নির্ধারিত হদ্দ হিসেবে এ শাস্তি প্রযুক্ত হবে না। কিন্তু তাদের সাথে বিয়ে হারাম এ জ্ঞান যদি তার না থাকে তবে তার উপর হদ্দ ও তাযির কোনটাই সাব্যস্ত হবে না।
ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ র. বলেন, হারাম হওয়ার বিষয়টি যদি তার জ্ঞাত থাকে তবে হদ্দ ওয়াজিব হবে। সূত্র, শরহে কানয, আল আইনী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪৬। মাতবায়া, আলমায়মুনা, কায়রো। তাতে লিখা হয়েছে, মাহরাম মহিলার সাথে সঙ্গমের অপরাধে কাউকে হদ্দ দেয়া যাবে না, যদি না সে বিবাহ করে থাকে। কারণ এই বিয়েটিকে সংশয়জনক বিবাহ মনে করা হবে। এটিই ইমাম আবু হানিফা র. এর অভিমত। অবশ্য সে যদি বিবাহ হারাম সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে তবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে। সাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন, উল্লেখিত অবস্থায় বিবাহ হারাম হওয়ার জ্ঞান থাকলে তার উপর হদ্দ প্রযোজ্য হবে। কারণ এসব মহিলার সাথে বিয়ে হারাম হওয়ার বিষয়টি অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত। সূত্র আলহিদায়া খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৬, মাতবায়া আলবাব আল হালবী, মিসর, ১৩৫৫ হিজরী।
তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৭৯-১৮০। ওয়াকিয়াতুল মুফতিয়্যিন, পৃষ্ঠা ৬১, প্রথম সংস্করণ, বুলাক, মিসর ১৩০০ হিজরী।

৯. আলমুগনী, ইবনে কুদামা, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ১৫২-১৫৩।

১০. শরহে ফাতহুল কাদীর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪৮, বংশ ও দুগ্ধপান সম্পর্কিত মহিলাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান।

১১. প্রাগুক্ত।

১২. আলবাদায়ে আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৫, অভিযুক্ত ব্যক্তি পঞ্চম বিয়ে করে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করেছে। এমতাবস্থায় আবু হানিফা র. এর মতে হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। তাযিরী শাস্তি প্রযোজ্য হবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র. এর মতে অভিযুক্তের উপর হদ্দ প্রযোজ্য হবে। শরহে কানয, আইনী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২৬।

১৩. শরহে ফাতহুল কাদীর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৪৮, আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৫, শরহে কানয, আইনী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২৬।

১৪. প্রাগুক্ত।

১৫. আলবাদায়ে, আলকাসানী, খণ্ড ৭,পৃষ্ঠা ৩৫। তাতে বর্ণিত হয়েছে, কেউ যদি স্ত্রীর বোনকে বিবাহ করে এবং তার সাথে সঙ্গম করে বসে, তবে আবু হানিফা র. এর মতে তার উপর হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। যদিও বিয়ে হারাম হওয়ার বিষয়টি তার জানা ছিল। এজন্য তাকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম আহমদ র. এর মতে অভিযুক্তের উপর হদ্দ প্রযোজ্য হবে। শরহে কানয আইনী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২৬।

১৬. শরহে ফাতহুল কাদীর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৪৮, হাফিয আদদীন আল আইনীতে লিখেছেন, পরস্ত্রী, অথবা কারো ইদ্দত পালনরত স্ত্রী, অথবা কারো তিন তালাক প্রাপ্ত স্ত্রী মুহাররামাতের পর্যায়ভুক্ত।

১৭. আলমুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা ২ ও ৯।

১৮. আল আহকামুস সুলতানিয়া, আলমাওয়ারদী পৃষ্ঠা ১১৩-১১৪।

১৯. আলমুগনী, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ১৫২-১৫৪।

২০. আলবাদায়ে, আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৪। তাতে বর্ণিত হয়েছে, মৃত মহিলার সাথে সঙ্গমের কারণে হদ্দ কার্যকর হয় না। এটি তাযিরযোগ্য অপরাধ। দেখুন আলমুগনী, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ১৫২। তাতে হযরত ইমাম আওযাঈ র. এর অভিমত বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, মৃত নারীর সাথে সঙ্গমের অপরাধে হদ্দ কার্যকর হবে। কোন মৃত নারীর সম্মুখ ভাগে যদি সঙ্গম করা হয় তবে সেটিকে একজন জীবিত নারীর সাথে সঙ্গম তুল্য মনে করা হবে। বরং এটি এর চেয়েও আরও জঘন্য। এটি খুবই মারাত্মক একটি অপরাধ। তাতে শুধু নারীর অধিকারই ক্ষুণ্ন করা হয়নি, মৃত লাশেরও মর্যাদাহানি করা হয়েছে।

অবশ্য উল্লেখিত ফকীহর এমন একটি মতামতও উদ্ধৃত করা হয়েছে, যাতে তিনি বলেছেন, মৃতের সাথে সঙ্গম অর্থহীন। অনুভূতিহীন অঙ্গে সঙ্গম করা না করা সমান। ফলে তাতে হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। কেননা মৃত মানুষের প্রতি কোন মানুষের যৌন আকর্ষণ থাকে না। ফলে এমন বিরল ঘটনার ব্যাপারে বিধিবদ্ধ কোন আইনের বিধান করা জরুরি নয়। কারণ হদ্দ এর শাস্তি মানুষকে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত রাখা এবং শিষ্টাচার শেখানোর জন্যে দেয়া হয়ে থাকে।

২১. আলজাওহারাতুন নাইয়ারা খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪৫। কোন নারী যদি বানরের সাথে সঙ্গম করে তবে তা কোন পুরুষের জীব জন্তুর সাথে সঙ্গম করার সঙ্গে তুলনীয়। এর অর্থ হলো, অভিযুক্তকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে। জন্তুর সাথে কোন মানুষের সঙ্গম ইমাম আবু হানিফা র. এর মতে তাযিরী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

২২. শরহে ফাতহুল কাদীর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৫০ তাতে বর্ণিত হয়েছে, নারী যদি কোন নারীর সাথে যৌন ক্রিয়া করে তবে উভয়কেই তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে। আলমুগনী খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ১৬২। নারীর সমকামিতাকে আলমুগনীর রচয়িতা যেনা বলে অভিহিত করেছেন। তবে শাস্তি হিসেবে তাযিরকেই প্রযোজ্য বলেছেন। তিনি বলেছেন, নারী যদি সমকামিতায় লিপ্ত হয় তবে সেটিকে যেনা গণ্য করতে হবে। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'কোন নারী যদি কোন নারীর সাথে যৌন ক্রিয়া করে তবে উভয়েই যেনাকারিণী গণ্য হবে।' তবে তাদের উপর তাযিরী শাস্তি প্রযোজ্য হবে। কারণ সত্যিকার অর্থে তাদের এ কাজের মধ্যে পুরুষাঙ্গের প্রবেশ পাওয়া যায় না। যেমন, দুজন লোক যদি যোনীপথ ছাড়া যৌন ক্রিয়া করে তবে তাদের উপর তাযিরী শাস্তি প্রযোজ্য।

২৩. কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা ৬৬। তাতে বর্ণিত হয়েছে, কেউ যদি লুতজাতির মতো সমকামের ঘটনা ঘটায়, তবে তাকে তাযিরী শাস্তি এবং যাবজ্জীবন জেল দেয়া হবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন, তার উপর হদ্দ প্রযোজ্য। তাবঈনুল হাকায়েক. শরহে যাইলাঈ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৮০, ইমাম আবু হানিফা র. এর মতে সমকামিতার অপরাধে হদ্দ প্রযোজ্য নয়। জামেউস সগীর গ্রন্থে কারাদণ্ডের উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন, এটিও যেনা অতএব হদ্দ এর শাস্তি প্রযোজ্য হবে। আলবাদায়ে আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৪, মুখতাসার আলকুদুরী, পৃষ্ঠা ১১৩। আল হিদায়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৬, আলজাওহারাতুন নাইয়ারা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪৫। আল লুবাব, আলমায়দানী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৯/৬০। দুয়ারুল হুক্কাম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮৪, শরহে কানয, আইনী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৬। আসসুরাখসী, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৯। তাতে লিখা হয়েছে, এগুলো এমন অপরাধ যেগুলোতে শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন নির্দিষ্ট শাস্তি নেই, ফলে তাযিরী শাস্তি প্রযোজ্য হবে। এছাড়া যদি সংশোধনমূলক কোন শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয় তবে সমকালীন ইমাম তথা শাসকের মতামতের উপর নির্ভর করবে। তিনি যদি কোন শাস্তিকে প্রয়োজনীয় মনে করেন, তবে দিতে পারবেন। কোন পুরুষ যদি কোন পরনারীর পায়ুপথে সঙ্গম করে তবে ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র. এর মতে তাতে হদ্দ প্রযোজ্য হবে কিন্তু ইমাম আবু হানিফা র.-এর মতে তাতে তাযিরী শাস্তি প্রযোজ্য হবে।

২৪. আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা ১৩।

২৫. আল আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী পৃষ্ঠা ২১২/২১৩।

২৬. শরহে আল কবীর, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ১৭৫/১৭৭। তাতে বর্ণিত হয়েছে, প্রথমোক্ত অভিমতটি ঐ হাদীসের ভিত্তিতে করা হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে, 'যাকে তোমরা লূত আ. এর জাতির মতো (বিকৃত) যৌনকর্ম করতে দেখতে পাও, তাদের কর্তা পাত্র উভয়কেই হত্যা করে ফেলো।' অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, 'উপরের ও নীচের উভয়জনকে রজম করো।' তাছাড়া এ ধরনের অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে যে, এ ধরনের অপরাধীকে রজম বা হত্যা করা হবে। তবে কিভাবে হত্যা করা হবে এ ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হযরত আলী রা. বলেন, এ ধরনের অপরাধীদের রজম করা হবে। কারণ লূত আ. জাতিকেও রজম করা হয়েছিল। দ্বিতীয় মতের ভিত্তি হলো, সেই হাদীস, যাতে বলা হয়েছে, কোন পুরুষ যদি কোন পুরুষের সাথে যৌন ক্রিয়া করে তবে তাদের উভয়েই যেনাকারী। কারণ যেনার সংগা হলো, কোন মানুষ তার যৌনাঙ্গ অপরের যৌনাঙ্গে প্রবেশ করাবে কোন বৈবাহিক সম্পর্ক কিংবা সম্পর্কের সংশয় ছাড়া। বস্তুত সমকামীতাও পরনারীর সাথে সঙ্গম করার মতোই একটি অপরাধ। এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা র. এর অভিমত হলো, পায়ু পথ সঙ্গমের কোন জায়গা নয়, তাই এতে যৌন ক্রিয়া সঙ্গমের পর্যায়ভুক্ত নয় বলে যেনা বলে বিবেচিত হবে না। আরো বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, আলমুগনী খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ১৫১-১৫২।

২৭. তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৮০/১৮১। কেউ যদি নিজ স্ত্রীর সাথে এমনটি করে তবে সর্বসম্মতভাবে তাতে হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। তবে নিষিদ্ধ কর্ম করার কারণে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে। আল জাওহারাতুন নাইয়ারা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪৫, আলমুগনী, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ১৬২। তাতে বর্ণিত হয়েছে, সে যদি নিজ স্ত্রীর পায়ু পথে সঙ্গম করে থাকে তবে কাজটি হারাম হয়েছে কিন্তু তাতে হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। কারণ স্ত্রীর সর্বাঙ্গই যৌন কর্মের ক্ষেত্র। কোন কোন ফকীহ তো এ কর্ম জায়েয হওয়ার পক্ষেও অভিমত দিয়েছেন। বস্তুত যে ক্ষেত্রে সংশয় ও মতপার্থক্য রয়েছে সে ক্ষেত্রে হদ্দ প্রয়োগের অবকাশ নেই। তবে সমকামিতার বিষয়টি এর চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

২৮. আলবাদায়ে আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৪। কোন জীবজন্তুর সাথে সঙ্গম হদ্দযোগ্য অপরাধ নয়। তবে এই অপরাধে তাকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে। কারণ এটি এমন অপরাধ যাতে নির্দিষ্ট শাস্তি নেই, তাই তাযিরী শাস্তি দাব্যস্ত হবে। শরহে কানয, আইনী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২৬। আল জাওহারাতুন নাইয়ারা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪৫। আল লুবাবুল মায়দানী খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬০। তাতে বর্ণিত হয়েছে, কেউ যদি কোন জীব জন্তুর সাথে সঙ্গম করে সে সেটির মালিক হোক বা না হোক তার উপর হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। কেননা এ কর্মটি যেনার সংগায় পড়ে না। তবে তাকে তাযিরী শাস্তি অবশ্যই দেয়া হবে। কেননা সে একটি নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন করেছে। দুরারুল হুককাম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮৪।

২৯. আলমুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড, ১৬, পৃষ্ঠা, ১৩/১৪। আশ শারহুল কবীর, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ১৭৭। আরো দেখুন, আহকামুস সুলতানিয়া, আল মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা ২১২। তাতে বর্ণিত হয়েছে, জন্তুর সাথে যে সঙ্গম করে সে যেনাকারী। সে যদি অবিবাহিত হয় তবে তাকে একশ বেত্রাঘাতের শাস্তি দিতে হবে। আর বিবাহিত হলে তাকে রজম করা হবে। কোন কোন ফকীহ বলেছেন, অপরাধী বিবাহিত অবিবাহিত যাই হোক না কেন, তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। কারণ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি কোন জন্তুর সাথে সঙ্গম করে সে এবং জন্তু উভয়কে হত্যা করা হবে।' আরো দেখুন, আলমুগনী, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ১৬৩। তাতে বর্ণিত হয়েছে, জীবজন্তুর সাথে সঙ্গমের বিধান সমকামিতার বিধানের মতো। ফকীহ হাসান বলেন, এ অপরাধে যেনার শাস্তি প্রযোজ্য হবে। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত হয়েছে, উভয়কেই হত্যা করা হবে। কারণ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'কেউ যদি জানোয়ারের সাথে সঙ্গম করে তবে তাকে এবং জানোয়ার উভয়কেই হত্যা করা হবে।'

৩০. আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা ৪৩।

৩১. আলমুগনী, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ১৫২।

৩২. শরহে ফাতহুল কবীর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৫০। তাতে লেখা হয়েছে, 'মূল লেখক এর বক্তব্য, যে ব্যক্তি পরনারীর সঙ্গে যোনীপথ ছাড়া অন্য কোন পথে সঙ্গম করেছে, এর অর্থ হলো, কেউ যদি দুই উরুর মাঝে কিংবা পেটের ভাজে রতিক্রিয়া সম্পন্ন করে যার মধ্যে পায়ু পথ পড়ে না তবে এই অপরাধীকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে। কারণ তাতে কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তি নেই। আল লুবাবুল মায়দানী খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৮, শরহে কানয, আইনী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২৬, কুদুরী, পৃষ্ঠা ১১০, মাতবায়া উসমানিয়া, ১৩০৯ হিজরী।

৩৩. আল মাবসূত, আসসুরাখসী, খণ্ড ২৪, পৃষ্ঠা ৩৬। তাতে বর্ণিত হয়েছে, অপরাধী অপরাধ কর্ম শুরু করে দিয়েছিল এবং সঙ্গম ছাড়া সে সঙ্গমের প্রাসঙ্গিক সব কর্মই সেরে ফেলেছে, তবে তার উপর ৩৯ বেত্রাঘাতের শাস্তি বর্তাবে। আলমুগনী, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ১৬২।

৩৪. আলফাতওয়া আলহিন্দিয়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫৭। এক ব্যক্তি স্বাধীন কোন পরনারীকে চুমু দিল, অথবা পরনারীর সাথে কোলাকুলী করল, অথবা যৌন উত্তেজনা নিয়ে স্পর্শ করল, তবে তাকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হবে।

৩৫. অধিকাংশ ফকীহ মনে করেন, নারীর মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব নয়। এটি মানলেও কোন পরনারীকে চুমু খাওয়া অপরাধ। কারণ এটি অন্যের ব্যক্তি মর্যাদায় হস্তক্ষেপ। গ্রন্থকার।

৩৬. শরহে কানুনে তাযিরাত, ডক্টর মুহাম্মদ ও মাহমুদ মুস্তফা। বিশেষ অংশ। প্রকাশকাল ১৯৪৮ দারুন নাশার আস্ সাকাফা, ইস্কান্দারিয়া, পৃষ্ঠা ২৪৩। মিসরীয় দণ্ডবিধির ২৬৮ নম্বর দফাতে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, কেউ যদি বল প্রয়োগ ও ভীতি প্রদর্শন করে কারো সম্ভ্রমহানি ঘটায়, অথবা এমন পদক্ষেপ নয়, তাকে তিন থেকে সাত বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হবে। আক্রান্ত নারীর বয়স যদি ১৬ (ষোল) বছর পূর্ণ না হয়ে থাকে, অথবা অপরাধী সেইসব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত দফা ২৬(খ) তে যাদের কথা বলা হয়েছে, তাহলে কারাবাসের সময় যতো ইচ্ছা ততো বাড়ানো যাবে সশ্রম কারাদণ্ড সর্বোচ্চ যে পরিমাণ দেয়া যেতে পারে। মিশরীয় দণ্ডবিধির ১২৬৯নং দফা এ বিষয়টির ব্যাখ্যায় বলেছে, কেউ যদি বলপ্রয়োগ বা ভীতি না দেখিয়ে নাবালেগা, বা নাবালেগ বালক বালিকার সম্ভ্রমহানি ঘটায়, যার বয়স এখনো আঠারো বছর পূর্ণ হয়নি, তবে তাকে কারাবাসের শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু আক্রান্ত বালক বালিকার বয়স যদি সাত বছর পূর্ণ না হয়ে থাকে, কিংবা অপরাধী যদি তাদের কেউ হয়ে থাকে দফা ২৬৭(খ)তে যাদের কথা বলা হয়েছে, তাহলে তাকে নির্দিষ্ট সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হবে। দফা ২৬৭ এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি আক্রান্তের পূর্বসূরীদের কেউ অথবা তার অভিভাবকদের কেউ, অথবা তার তত্ত্বাবধানকারীদের কেউ, অথবা সে যাকে টাকার বিনিময়ে শ্রম দেয়, অথবা উপরে উল্লেখিতদের কারো অর্থের বিনিময়ে শ্রমিক হয়ে থাকে।

৩৭. আলফাতওয়া আল আসাদিয়া, খণ্ড ১, পৃষ্ঠ ১৫৯। তাতে বর্ণিত হয়েছে, কেউ যদি কাউকে বলে, তুমি তোমার নিজের পাত্র থেকে আমাকে এক পাত্র পানি দাও, তা আমি আমার জানোয়ারকে খাওয়াবো, প্রত্যুত্তরে ঐ লোকটি কাপড় খোলে তাকে লজ্জাস্থান দেখিয়ে বলল, এ থেকে আমি তোমাকে পান করাবো, তাহলে সে তাযিরী শাস্তিযোগ্য অপরাধী বিবেচিত হবে।

৩৮. মিসরীয় দণ্ডবিধির ২৭৮ নং দফায় বলা হয়েছে, কেউ প্রকাশ্যে কোন অশ্লীল অসম্মানজনক কর্মকাণ্ড ঘটালে, তাকে কারাবন্দির শাস্তি দেয়া যেতে পারে। তবে এ শাস্তি এক বছরের চেয়ে বেশি হবে না। অথবা তাকে ৫০০ মিশরীয় পাউন্ডের জরিমানা করা হবে।

৩৯. আলফাতওয়া আল আফকারুবিয়া, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৭। তাতে বর্ণিত হয়েছে, কেউ যদি কোন তরুণী বা মহিলাকে অপহরণ করে কোন অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। অপহৃত নারীকে ফিরিয়ে না দেয়া পর্যন্ত এ অপরাধে অপরাধীকে কারারুদ্ধ রাখা হবে। এ অভিমত ইমাম মুহাম্মদ র. এর। অথবা যে পর্যন্ত না সে অপহৃতার অবস্থান ও ভাগ্য সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য দেবে ততোদিন পর্যন্ত তাকে বন্দি করে রাখা হবে।

৪০. আল ইশবা আন-নাযায়ের, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০০। তাতে বর্ণিত হয়েছে, এক লোক কারো স্ত্রীকে অপহরণ করে তাকে অন্য কারো সাথে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে, অথবা কোন তরুণীকে অপহরণ করে অনুরূপ কাণ্ড করেছে তাকে তওবা না করা পর্যন্ত কিংবা মৃত্যু পর্যন্ত বন্দি করে রাখা হবে। কারণ সে সমাজে অস্থিতিশীলতা ছড়ানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

৪১. উদ্দাতু আরবাবিল ফাতওয়া, পৃষ্ঠা ৭৮। কোন নারী যদি কোন পর পুরুষের ঘরে স্বেচ্ছায় গমন করে এবং পরপুরুষকে ভালোবাসে, তবে সেই পুরুষ যদি পূর্বে এমন কর্ম না করে থাকে তবে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে। যদি পুরুষ পূর্বেও এমন ঘটনা ঘটিয়ে থাকে, তবে বিচারক তার বিবেচনা মতো শাস্তি দিতে পারে। ইচ্ছা করলে বিচারক প্রহার করতে পারেন, অথবা বন্দি করতে পারেন, দেশান্তর করতে পারেন কিংবা সংশোধনীমূলক কোন ব্যবস্থা নিতে পারেন।

৪২. আলফাতওয়া আলহিন্দিয়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫৭।

৪৩. কাশশাফুল কিনা আন মাতানিল আকনা, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৭৫, তাতে বর্ণিত হয়েছে, কেউ যদি যেনায় জড়িয়ে পড়ার আশংকা থেকে হস্তমৈথুন করে, অথবা শারীরিক কোন কারণে হস্তমৈথুন করে, তাহলে তার উপর কোন শাস্তি হবে না। ফকীহ মুজাহিদ বলেছেন, এক সময় মুরব্বীরা তরুণদেরকে যৌন অপরাধ থেকে মুক্ত থাকার জন্য হস্তমৈথুনে উৎসাহিত করতেন। মুজাহিদ আরো বলেন, এমনটি তখনই জায়েয যখন সুস্থ স্বাভাবিক বা স্বাস্থ্যবান কোন যুবকের পক্ষে কোন মেয়েকে বিয়ে করার আর্থিক কিংবা পারিপার্শিক সংগতি না থাকে। কারণ তখনকার এ কাজটি ছিল প্রয়োজনের খাতিরে। এভাবেই তৎকালীন যুবকেরা তাদের যৌন চাহিদা পূরণ করতো। যদি যুবক বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে তখন আর তার পক্ষে এমনটি করা জায়েয হবে না। কারণ বিনা প্রয়োজনে এমন কাজ করা কঠিন গোনাহ। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে ঘোষণা করেন, 'ওয়াল্লাযিনাহুম লি ফুরুযিহিম হাফিযুন' যারা তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে।' ফকীহ ইবনে আরাফা তার 'হাযব' গ্রন্থে এ মর্মে একটি হাদীসও উদ্ধৃত করেছেন। 'আলমাবদা' এর গ্রন্থকার বলেছেন, এক্ষেত্রে মহিলাদেরও একই বিধান। কারণ তারাও অনেক ক্ষেত্রে পুংলিঙ্গের মতো দণ্ডবিশেষ ব্যবহার করে। ইবনে আকীল এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'পুরুষের জন্যে এটা জায়েয সে তার স্ত্রী কিংবা বাদীর দ্বারা হস্তমৈথুন করাবে। কারণ এ কাজটি তার জন্যে স্ত্রী বা বাদীকে চুমু দেয়ার পর্যায়ভুক্ত একটি কর্ম মাত্র।'

অনুবাদ : শহীদুল ইসলাম

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৮
বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৩, পৃষ্ঠা : ১০১

# ঢাকায় দুদিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক ইসলামী আইন সেমিনার

## আইন ও বিচার প্রতিবেদন

বিগত ১১ ও ১২ জানুয়ারী ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ ও 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট' এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকার বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে 'ইসলামী আইন ও সমকালীন সমাজে এর প্রয়োগ' শীর্ষক দুদিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক ইসলামিক ল' সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

এই সেমিনারে মোট সাতটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের বিভিন্ন অধিবেশনে মোট ১২টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত ও আলোচিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন প্রধান বিচারপতি মোঃ রুহুল আমীন। সভাপতিত্ব করেন, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব এবং বিআইআইটি-এর চেয়ারম্যান শাহ আব্দুল হান্নান। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, বিচারপতি খলিলুর রহমান খান, (পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের শরীয়া অ্যাপিলেট বেঞ্চের সাবেক চেয়ারম্যান, সাবেক রেকটর, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামাবাদ, সাবেক প্রধান বিচারপতি লাহোর হাইকোর্ট) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, ড. এম হাশিম কামালী, (প্রাক্তন অধ্যাপক, আইন বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়া) এবং প্রফেসর ইমতিয়াজ গোলাম আহমাদ, ডিন ও বিভাগীয় প্রধান, আইন অনুষদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এতে আরো বক্তব্য রাখেন, প্রফেসর ড. আবুল হাসান এম সাদেক, ভাইস চ্যান্সেলর, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, প্রফেসর ড. আবুবকর রফিক, প্রোভিসি, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম এবং প্রফেসর ড. এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম, ডীন, আইন অনুষদ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব মোস্তফা কামাল মজুমদার, সম্পাদক ডেইলী নিউ নেশন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, জেনারেল সেক্রেটারী, ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধান বিচারপতি মোঃ রুহুল আমীন বলেন, দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপগুলো সাময়িকভাবে দুর্নীতির বিস্তার রোধ করেছে, কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষের চরিত্র পরিবর্তনে এসব পদক্ষেপের সাফল্য কমই পাওয়া যায়। একমাত্র ইসলামি আইন কাঠামোসহ ইসলামি শিক্ষাই একজন দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির

*দুইদিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক ইসলামী ল' সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান বিচারপতি মো: রুহুল আমীন*

মনে প্রয়োজনীয় নৈতিক মনোবল তৈরী করতে পারে, যাতে সে দুর্নীতিতে লিপ্ত না হওয়ার জন্য আহবান অনুভব করে। একইভাবে অধিকাংশ সন্ত্রাসবিরোধী পদক্ষেপ কাঙ্খিত ফলাফল আনতে ব্যর্থ হচ্ছে। এর মূল কারণ, আমরা সমস্যার মূলে আঘাত হানতে ব্যর্থ হয়েছি, যেটা একমাত্র ইসলাম ও ইসলামি আইন কাঠামোর মাধ্যমেই করা যায়। ইসলাম বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ ও বহিরাবরণের দিক থেকে কোনো সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে না বরং সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে তার প্রকৃতি ও কারণ বুঝার চেষ্টা করে এবং সমস্যার মূলোৎপাটন করে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর সময়ে ইসলামি আইন কাঠামোর সূচনা ও বিকাশ শুরু হয়। পরে বিভিন্ন খেলাফতের সময় তা পরিপক্বতা লাভ করে। তখন সমাজে অপরাধপ্রবণতা ছিল কম এবং মানুষ সুখ শান্তিতে বসবাস করত।

প্রধান বিচারপতি বলেন, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, স্রষ্টার আইন হিসেবে ইসলামে রয়েছে সবচেয়ে চমৎকার আইন, কানুন ও নিয়ম পদ্ধতি, যা সুবিচার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ইসলামী আইনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তা বর্ণ, গোত্র, ধর্ম নির্বিশেষে সকল যুগের সকল সমাজের জন্য বাস্তবায়নের উপযোগী। ইসলামী বিচার ব্যবস্থা অত্যন্ত গতিশীল এবং স্থান ও সময়ের পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এ সঙ্গতি সাধনের জন্যই ইসলামে ইজতিহাদের অনুমতি রয়েছে। বর্তমান সময়ে আমাদের সমাজে ইসলামী আইনের উপযোগিতা কোন অংশেই কম নয়। বরং আজকের প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োজনিয়তা অনেক বেশি।

তিনি ইসলামি আইন ও বিচার ব্যবস্থার ওপর গবেষণা ও অধ্যয়ন আরো বৃদ্ধি এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ইসলামি আইনের কার্যকারিতা মানুষের সামনে তুলে ধরার আহবান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে শাহ আব্দুল হান্নান বলেন, ইসলামী আইনের ব্যাপারে অনেকের অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। অনেকে মনে করেন, ইসলামী আইন শুধু অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়গুলোর জন্য, অথচ ইসলামী আইনে অপরাধসংক্রান্ত আইন মোট আইনের ৫ শতাংশের বেশি হবে না। অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, পারিবারিক আইনসহ সব আইন ও বিধি-বিধান ইসলামি আইনের আওতার মধ্যে রয়েছে।

স্বাগত ভাষণে এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এ সম্পর্কে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। এই পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার অবিভাজ্য অংশ মানবজাতির ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সর্ব ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধিবিধানই ইসলামের সামষ্টিক আইন।

পৃথিবীর আদি মানব হযরত আদম আ. ছিলেন আল্লাহর সৃষ্ট প্রথম মানব এবং প্রথম নবী। যাকে পৃথিবীতে পাঠানোর সময় আল্লাহ তাআলা নির্দেশ করেন, 'আমি বললাম তোমরা নেমে যাও, পরে যখন আমার কাছ থেকে কোন জীবন বিধান তোমাদের কাছে পৌছবে, তখন যারা সেই বিধানের আনুগত্য করবে, তাদের কোন ভয় নেই, তারা দুর্দশাগ্রস্ত'ও হবে না। (সূরা বাকারা : ৩৮)

যুগে যুগে পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা নবী রসূলগণকে পাঠিয়েছেন, তাঁরা সকলেই গণমানুষকে আল্লাহর আইন অনুযায়ী জীবন পরিচালনার দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহর পয়গামবাহী নবী রসূলগণের মধ্যে আমাদের নবী মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ স. সর্বশেষ ও সর্ব শ্রেষ্ঠ নবী, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য ইসলামকে একমাত্র জীবন বিধান হিসেবে পূর্ণতা দান করেছেন। ঘোষণা করেছেন '... আজ আমি তোমাদের দীনকে পূর্ণ করে দিলাম' (আল মায়েদা : ০৩)।

মহান আল্লাহ আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র তথা সমগ্র সৃষ্টি জগতকে অবশ্য পালনীয় বিধি বিধান ও নিয়ম নীতির অধীন করে দিয়েছেন। যে অলংঘনীয় বিধানের কোন পরিবর্তন নেই, যাতে কোন ধরনের ব্যত্যয় ঘটে না। যার ফলে আমরা দেখতে পাই, দিন-রাত্রির পরিবর্তন, চন্দ্র-সূর্যের আবর্তন ইত্যাদি আবহমান কাল থেকে একই অলংঘনীয় বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে আসছে।

মানুষের জন্ম-মৃত্যু, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য এই অলংঘনীয় নিয়মের অধীন।

এখানে আল্লাহ ছাড়া কারো হস্তক্ষেপের কোন অবকাশ নেই। অন্য দিকে আল্লাহ, রসূল, কিতাব, কিয়ামত ও পরকালের হিসাব নিকাশে বিশ্বাস এবং আল্লাহর ইবাদত– নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, পারস্পরিক লেনদেন, আচার অনুষ্ঠান এবং দণ্ড ও শাস্তি ইত্যাদিতে আল্লাহ তাআলা তাঁর বিধান মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন, যা ইসলামী শরীআহ নামে পরিচিত। শরীআ'হ পালনের ক্ষেত্রে মানুষ ইচ্ছাধীন।

ইসলামী আইন সাদা কালো আরব অনারব নারী-পুরুষ সকলের জন্য সমভাবে কল্যাণকর। ইসলামী আইন মানুষের জীবন সম্পদ ও সম্মানকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দান করেছে। ইসলামী আইন সুবিচার নিশ্চিত করেছে। বিচারের ক্ষেত্রে স্বজন প্রীতি ধনী-দরিদ্র বিবেচনার উর্ধে রেখেছে।

ইতিহাস সাক্ষী, হাজার বছরের চেয়েও বেশী সময় পৃথিবীর বিশাল অংশ ইসলামী আইনে শাসিত হয়েছে।

ইউরোপের বিরাট অংশ শতশত বছর ইসলামী আইনে শাসিত হয়েছে। এই উপমহাদেশেও প্রায় ৭শ বছর দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় বিচার ব্যবস্থা ইসলামী আইনেই পরিচালিত হয়েছে। বৃটিশ উপনিবেশে পরিণত হওয়ার পরও উপমহাদেশে প্রায় একশ বছর ইসলামী আইনে বিচার কার্য পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে মুসলমানদের পারিবারিক আইন ছাড়া অন্যান্য আইনগুলোতে বৃটিশরা নিজেদের অনৈসলামিক নীতি ও মতাদর্শ চাপিয়েছে। পরিতাপের বিষয়, বৃটিশরা বিতাড়িত হওয়ার পরও আমাদের দেশ সেই আইনেই শাসিত হচ্ছে।

প্রচলিত আইন আমাদের সমাজ জীবনে শান্তি শৃংখলা নিশ্চিত করতে পারেনি। অন্যায় ও অপরাধের হার ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বর্তমানে আমাদের সমাজের অবস্থা এই যে, ন্যায় ও সত্যবাদিতা, দুর্নীতি ও অপরাধের কাছে পরাজিত। সন্ত্রাস দুর্নীতি আমাদের সমাজ জীবনের শান্তি কেড়ে নিয়েছে। সর্বক্ষেত্রেই অনাচার অবিচার আমাদের সমাজকে আজ গ্রাস করে ফেলেছে।

এসব অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে বহু ধরনের আইন জারী করা হয়েছে কিন্তু কোনটাই উল্লেখযোগ্য কোন সুফল বয়ে আনতে পারেনি।

ইসলামী আইন তথা আল্লাহর আইন যেখানে প্রায় হাজার বছরের বেশি সময় বিশ্ব শাসন করেছে, বিশ্বকে উপহার দিয়েছে শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব, নিয়ম, শৃংখলা, সুবিচার, শোষণহীন সমাজ, মানুষের মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা, সেখানে বর্তমান আইন তথা মানুষের তৈরি আইন দুই তিনশ বছরের শাসনের মধ্যেই বিশ্বকে উপহার দিয়েছে দু-দুটি মহাযুদ্ধ, যা সমগ্র বিশ্ব মানব গোষ্ঠীকে বিপর্যস্ত করেছে। তদুপরি তৃতীয় আর একটি মহাযুদ্ধ তথা আনবিক ধ্বংসকারিতার আতংকে সমগ্র বিশ্ব মানবতা ধুকছে। বস্তুত মানুষের তৈরি আইন কোনো ধ্বংস প্রক্রিয়াকে রুখতে পারছে না। কোনো জুলুম, কোনো শোষণকে প্রতিহত করতে পারছে না। সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস, জুলুম, অনাচার ও অশান্তির অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে।

এ সব কিছুর মূলে রয়েছে এই মানুষের তৈরি আইন। আজ আমাদের বুদ্ধিজীবী ও এলিট শ্রেণীকে এ বিষয়ে যথার্থই ভাবতে হবে, আমরা কি আল্লাহর তৈরি আইনকে উপেক্ষা করে আমাদের ধ্বংসকে আরো ত্বরান্বিত করবো? অথবা আল্লাহর প্রতি ঈমানকে সুদৃঢ় করে এগিয়ে যাবো নিজেদের এবং সমগ্র বিশ্ব মানবতার কল্যাণ ও শান্তিকে সুনিশ্চিত করতে।

বিশেষ অতিথি প্রফেসর ইমতিয়াজ গোলাম আহমাদ বলেন, দীর্ঘ দিন ধরে ইসলামী আইন আমাদের সমাজে প্রয়োগহীন অবস্থায় রয়েছে, অথচ সামাজিক প্রশাসনিক, বিচার বিভাগসহ সকলক্ষেত্রে ইসলামী আইনের সঠিক প্রয়োগ ছাড়া আমরা ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী আইনের কার্যকারিতা ও কল্যাণ অনুধাবন করতে পারবো না। ইসলামী আইন

*বক্তব্য রাখছেন পাকিস্তানের ইসলামী শরীআ'হ্ বেঞ্চের সাবেক চেয়ারম্যান বিচারপতি খলীলুর রহমান খান, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন প্রফেসর ইমতিয়াজ গোলাম আহমদ, মালয়েশিয়ার বিশিষ্ট-বুদ্ধিজীবী প্রফেসর ড. হাশিম কামালী, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আব্দুর রউফ। (বাম দিক থেকে পর্যায়ক্রমে)*

সম্পর্কে ভুলধারনা ও জ্ঞানের অভাবই আজকে ইসলামী আইনের অনুপস্থিতির বড় কারণ। দুঃখজনকভাবে মুসলিম অপরাধ দমন আইন ও পারিবারিক আইন সম্পর্কে যথাযথ জানা ও বোঝার চেষ্টা হচ্ছে না। সমাজে ইসলামী আইন সম্পর্কে লোকদের বিভ্রান্তি দূর করার জন্য ইসলামী আইনের সঠিক প্রচার ও প্রয়োগ জরুরী।

প্রফেসর ড. হাশিম কামালী বলেন, বিচার হচ্ছে একটি ডাইনামিক ধারণা। ইসলামী আইনকে মনে করা হয় সেকেলে। আসলে তা নয়। ইসলামী আইন চির আধুনিক। মানুষের জীবন ও সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের কল্যাণে ইসলামী আইন প্রয়োগ করা যায়।

বিচারপতি খলিলুর রহমান খান বলেন, ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। ইসলামী আইন সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছে। শান্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ পরোপকার ও জনকল্যাণই ইসলামী আইনের মূল চেতনা। আজ আমাদের সমাজে ইসলামী আইন চালুর বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নিতে হবে। এজন্য দেশে দেশে গণজাগরণ সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষার সকল পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছারও প্রয়োজন রয়েছে।

দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ড. মোহাম্মদ এনামুল হক, সাবেক আইজিপি এবং মেম্বার বাংলাদেশ ল' কমিশন।

এই অধিবেশনে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়।

'অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামী আইনের কার্যকারিতা: কেসাসের বিধান প্রসঙ্গ' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রফেসর ড. এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম। 'সন্ত্রাসবাদের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি: একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মোঃ মনীরুল আযম, সহকারী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। উপস্থাপিত প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন, অধ্যাপক ড. হাশিম কামালী, সাবেক প্রধান, আইন

বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া এবং ড. আব্দুল জলিল, ডীন, আইন অনুষদ, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন, প্রফেসর ড. আবুল কালাম পাটোয়ারী, সাবেক চেয়ারম্যান, আইন ও আল ফিকহ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

এই অধিবেশনে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়।

'সমসাময়িক সমাজের উন্নয়ন কৌশলের দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে ইসলামী আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (মাকাসিদ আস শরীয়া)' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মোহাম্মদ মঞ্জুর-ই-ইলাহী, সহকারী অধ্যাপক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর। 'বাংলাদেশে মুসলিম নারীর ভরণপোষণ: প্রেক্ষিত ইসলাম' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নাহিদ ফেরদৌসী, সহকারী অধ্যাপক, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর। প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন, প্রফেসর ইমতিয়াজ গোলাম আহমদ, ড. সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া, সহযোগী অধ্যাপক প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব রুহুল আমীন রোকন, সহযোগী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ড. বোরহান উদ্দীন খান, ডীন, আইন অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এতে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। 'সার্বজনীন মানবাধিকার ও কায়রো ঘোষণা: একটি তুলনামূলক আলোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এডভোকেট শহীদুল ইসলাম ভূইয়া। 'বিচার ব্যবস্থায় ইসলামী আইনের অনুশাসন, মানবাধিকার ও বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. গাজী উমর ফারুক, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া। প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন বিচারপতি খলিলুর রহমান খান, প্রফেসর ইমতিয়াজ গোলাম আহমদ।

পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি মোঃ আব্দুর রউফ, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার, বাংলাদেশ। এতে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। 'ইসলামী আইন ও সমসাময়িক সমাজে এর প্রয়োগ: প্রসঙ্গ পাকিস্তান' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিচারপতি খলিলুর রহমান খান। 'আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের ধারণা ও ক্রমবিকাশ: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, জনাব নূর মোহাম্মদ আজমী (মিল্লাত), সহকারী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম। প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন ড. এম হাশিম কামালী, ব্যারিস্টার মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন।

ষষ্ঠ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন, প্রফেসর ইমতিয়াজ গোলাম আহমদ।

এতে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। 'ইসলামী আইনের গতিশীলতা ও মাকাসিদ আস শরীয়ার ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, ড. এম হাশিম কামালী। 'ইসলামী আইনের গতিশীলতায় ইজতিহাদের ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্যারিস্টার মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন। প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন প্রফেসর ড. আবুবকর রফিক ও মিসেস নাসিমা হাসান।

*সমাপ্তি অধিবেশনে মঞ্চে উপবিষ্ট (ডান দিক থেকে) ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ-এর জেনারেল সেক্রেটারী এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, BIIT-এর নির্বাহী পরিচালক জহুরুল ইসলাম এফসিএ, সাবেক প্রধান বিচারপতি মাহমুদুল আমীন চৌধুরী (মাঝে) BIIT এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা: লুৎফর রহমান, সেমিনার ব্যবস্থাপনা কমিটির সেক্রেটারী ড: মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী*

সপ্তম ও সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ড. মোঃ লুৎফর রহমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিআইআইটি। প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব মাহমুদুল আমিন চৌধুরী।

বিচারপতি মাহমুদুল আমীন চৌধুরী বলেন, আমাদের দেশে কিছু মানুষ না জেনেই ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে কথা বলে। বর্তমানে অশান্ত পৃথিবীতে একমাত্র ইসলামই শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তিনি বলেন, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। একটি সুখী ও শান্তিপূর্ণ সমাজ পরিচালনার সব উপাদানই এর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু আমাদের জ্ঞানের অভাব ও অন্যান্য কারণে ইসলামের বাস্তব প্রয়োগ নেই বললেই চলে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ইসলাম বিশ্বমানুষের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি আনতে পারে। ইসলামের কোন বিকল্প নেই। মানুষ যদি সততার সাথে ইসলামের বিধি বিধান বিচার ব্যবস্থা ও আইনী কাঠামো সম্পর্কে পড়াশুনা করে তাহলে আমি আশা করি সকলেই আমাদের সাথে একমত হবেন। তিনি বলেন, ইসলামী আইনের বিষয়বস্তু এমন বিস্তৃত যে তা বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারে।

বিচারপতি মাহমুদুল আমীন চৌধুরী বলেন, আমাদের দেশের কিছু লোক না জেনেই ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে কথা বলে। তাদের ইসলাম সম্পর্কে কোন ধারণা নেই এবং তারা জানারও চেষ্টা করে না। আমাদের ধর্মতত্ত্ববিদরাও ইসলামকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করেন না। কতিপয় লোক ইসলামী আইনের সমালোচনা করে তারা ইসলামী

আইনে চোরের হাত কাটার শাস্তিকে সামনে নিয়ে আসে। ইসলামী আইনের অন্যদিকগুলোর দিকে তাকায় না। একজন মুসলমান হিসাবে আমি মনে করি, ইসলামের বিধি বিধান অনুসরণের মধ্যে শুধু মুসলমান নয় সমগ্র মানবজাতির শান্তি ও নিরাপত্তা নিহিত রয়েছে। আজ মুসলমানদের সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করা হচ্ছে। মিডিয়া ইসলামের শত্রুদের হাতে থাকার কারণেই এটা সম্ভব হচ্ছে। এরা শুধু মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে বলছে। অন্যকোন ধর্মের বিরুদ্ধে বলছে না। এ অপপ্রচারের কারণ হচ্ছে বর্তমান পৃথিবীতে ইসলাম উদীয়মান শক্তি। ইসলামের এই সম্ভাবনাকে থামানোই তাদের উদ্দেশ্য।

দুদিন ব্যাপী এই সেমিনারে কয়েকটি সুপারিশ পেশ করা হয়। সুপারিশ পেশ করেন ড. মোহাম্মদ মঞ্জুর-ই-ইলাহী।

**সম্মেলনের সুপারিশমালা**

১. ইসলামী আইনের গতি প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং বর্তমান যুগে এর প্রায়োগিক পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণা জোরদার করতে হবে।

২. শিক্ষার সকল স্তরে ইসলামী শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং ইসলাম অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

৩. মুসলিম সমাজকে তাদের অধিকার ও করণীয় সম্পর্কে সচেতন ও অবহিত করতে হবে।

৪. বিচার, প্রশাসন, অর্থ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রকে ইসলামীকরণের জন্য গবেষণা জোরদার করতে হবে।

৫. সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-কারিকুলামে ইসলামী আইনকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৬. ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থার উপর ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তন এবং পেশা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তথা আলীয়া ও কওমি মাদ্রাসাসমূহে ইসলামী আইনের পঠিত বিষয়গুলো পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

৮. সরকার কর্তৃক একটি ইসলামিক ল' কমিশন গঠন করে প্রচলিত আইনগুলোকে ইসলামীকরণের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৯. আধুনিক ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত বিশ্বমানের গবেষক ও মুজতাহিদ তৈরীর জন্য সরকারী ও জাতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১০. জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর স্বীকৃত অধিকার প্রয়োগ করতে হবে।

১১. যে কোন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াকে সামনে রাখতে হবে।

১২. আমাদের জাতীয় জীবনে আধুনিক ও নতুন সমস্যার সমাধান কল্পে বাংলাদেশে একটি জাতীয় শরীয়া কাউন্সিল গঠন করতে হবে।

*শহীদুল ইসলাম ও*
*এস এম আবদুল্লাহ*

REGD. NO. DA 237(1) ISLAMI AIN O BICHAR : January-March -2008, TK : 35